প্রেমের ফসল

শাহী সুরমা

বিয়ের প্রায় পাচ মাস হয়ে গেল। আজও আমাকে উঠিয়ে নেয়ার কিংবা বৌ-ভাতের তারিখটা নির্ধারণ করা গেল না। সমস্যা একটাই, বেবীআপা, মানে আমার ছোট ননাসের বাচ্চা হবে। এ কারণে ওরা ঠিক মতো আনন্দ ফুর্তি করতে পারবে না। আমার স্বামী আবার লতাদের বাড়িতে গার্ডিয়ান হিসেবে আছে প্রায় আঠারো বছর। আমার মাথায়ই আসে না এই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ বেবীআপার মনে বাচ্চা নেয়ার শখ জাগলো কেন? ব্যাপারটি আরো পরে জানলাম। যাই হোক ঘটনাটি হলো এই-

সুন্দরী গরিব ঘরের এক সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন বেবীআপার স্বামী। স্বামী বেচারা দেখতে ছিল একেবারে আফ্রিকান মডেল।

বিয়ের দশ বছরের মধ্যে ঘর আলো করে কালো মুক্তা, শ্যামলা মিতা ও ফর্শা লতা আসে। মুক্তার আব্বা আবার মুক্তাকে খুব ভালোবাসতেন। আর বেবীআপার জন্য তার ছিল জান হাজির টাইপের অবস্থা। প্রচুর ধনী ছিলেন মুক্তার বাবা। মুক্তাকে টাঙ্গাইলের কুমুদিনী স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল।

১৯৮৬ সালের শেষের দিকের কথা। মুক্তাকে সবাই স্কুলে দেখতে যাচ্ছিল। মুক্তার আব্বা নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। হঠাৎ একটা বাস এসে ধাক্কা দেয়ায় গাড়ি উল্টে মুক্তার আব্বা সে জায়গাতেই মারা যায়। গাড়িতে আরো ছিল চার বছরের লতা ও বেবীআপা। লতাকে পরে গাড়ি কেটে বের করে আনতে হয়। আর বেবীআপা মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে অনেক দিন যাবৎ স্মৃতিভ্রষ্ট ছিলেন।

এরপর শুরু হলো বেবীআপার তিন কন্যাকে নিয়ে বাচার সংগ্রাম। লতার আব্বা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি সব তার পার্টনাররা দখল করে নেয়। এরপর শুরু হয় বেবীআপার আরেক যন্ত্রণাময় জীবন।

এ কষ্টের সংগ্রামে হঠাৎ করেই এক চাচাতো দেবর জীবন সঙ্গী হিসেবে পেতে চাইলো বেবীআপাকে। কিন্তু তিন কন্যা ছাড়া বেবীআপা তখন যেন আর কিছুই ভাবতে পারছিলেন না।

দেবরটি খুবই ভালোবাসতো বেবীআপাকে। বেবীআপার দেবর তার থেকে প্রায় দশ বছরের ছোট। হঠাৎ করেই সে সউদি আরব চলে গেল এবং বেবীআপাকে বলে গেল, আমি যেদিনই ফিরে আসি না কেন, তোমাকেই বিয়ে করবো ভাবী। এই কথাটি মনে রেখো।

সউদি আরব গিয়েও সে বেবীআপাকে ভুলে যায়নি। সব সময় ফোনে খোজখবর নিতো। চিঠি দিতো। মেয়েদের লেখাপড়াতে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতো। এভাবে পনেরোটি বছর কেটে গেল।

সে এক সময় ফিরে এলো দেশে। তিন মেয়ের সামনেই এবার বেবীআপার দেবর সরাসরি প্রস্তাব রাখলো বেবীআপাকে বিয়ে করার। মুক্তা মেনে নিল। এবং আমার স্বামী মেনে নিলেন।

মুক্তা এমনিতেই সব সময় নিজেকে পিতার মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করতো। ও চাইতো ওর মা যেন একজন ভালো জীবন সঙ্গী পায়।

ওই রাত্রেই বেবীআপার বিয়ে হলে গেল।

পরদিন সকালে রাগ করে লতা ও মিতা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তারা কিছুতেই তাদের মায়ের এ বয়সের বিয়েকে মেনে নিতে পারছিল না। পরে অবশ্য তারাও মেনে নিয়েছিল। লতা, মিতা বাড়িতে ফিরে এলো। ঘরোয়াভাবে তারা সবাই মিলে একটা অনুষ্ঠান করলো।

দুই মাস দেশে ছিল বেবীআপার স্বামী।

প্রেমের সেই ফসল এই বাচ্চা। বেশি বয়সে বাচ্চা হওয়ার কারণে হরমোনের অভাব ছিল। এ কারণে মেয়েটি সব সময়ই অসুস্থ থাকে। হাজার রকম রোগ বাসা বেধেছে বেবীআপার ছোট্ট এই মেয়েটির শরীরে। তবু সবাই খুব ভালোবাসি আমরা এই মেয়েটিকে। মুক্তা তো ওকে ছাড়া ঘুমাতেই পারে না। আর আমি সামরিনকে ছাড়া

কিছুই ভাবতে পারি না। প্রতিদিন কমপক্ষে একবার হলেও ফোন করে মেয়ের খোজখবর নেয় সামরিনের আব্বু।

এখনো দুলাভাই নিয়মিত ফোন করেন। মেয়েদের খোজখবর নেন।

মিতার বিয়ে হলে গেছে। মুক্তা বড়, তারপরেও কালো হওয়াতে খুব কষ্ট হচ্ছে বিয়ে দিতে। ওর কাকা মানে বেবীআপার স্বামী খুবই চেষ্টায় আছে মুক্তাকে বিয়ে দিতে।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

না

- রানা

বাস। কিন্তু এত দেরি কেন? তবুও ভালো, এসেছো। বেটার লেট দেন নেভার। এতো লোক! কিন্তু কি করবো? উপায় নেই। তারপরও উঠতে হবে। বহদ্দরহাট। মাঝখানে আরো দুটো স্টপেজ। তারপরেই লালখান বাজার। হয়তো আধঘণ্টার মাঝেই পৌছে যাবো। কিন্তু বিধি বাম। বাস গতিপথ পরিবর্তন করছে কেন?

সামনেই অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। পাশ থেকে আওয়াজ এলো।

আর রক্ষা নেই। হুড়মুড় করে নামলাম। কিছুক্ষণ হাটা। তারপর ট্যাকসি। সামনে ব্লক। বেশি দূর যেতে পারিনি। আবারও নামা। আবারও হাটা। একটা রিকশা। এবারও বেশিক্ষণ যেতে পারিনি। কারণ সামনে মিছিল। নেমেন যেতে হলো। আবারও এক পথ চলা। এবার টেম্পো, টেম্পোই সই। নাহ... আবারও নামতে হলো। আবার সেই মিছিল। এ অ্যাকসিডেন্টের জন্যেই আজকের এ দুরবস্থা। আরো অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষে বৃটিশ কাউন্সিল পৌছালাম। নির্ধাতির সময় থেকে দুই ঘণ্টা লেট। যার জন্যে এসেছি তাকে পাওয়া দুরাশা মাত্র।

শুনে বন্ধুরা হাসে। এতো কষ্ট করে কেন গেলাম।

জবাবে বলি, এতো কিছুর পরও যদি তাকে সেখানে পেতাম তাহলে বুঝতাম কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু না ...। অহহো! বলতেই ভুলে গেছি। দিনটা ছিল ভ্যালেনটাইনস ডে। চট্টগ্রামে এদিনটি যেন নির্বিঘ্নে কাটে না। কোনো না কোনো সমস্যা লেগেই থাকে।

বিধি বাম। যা হওয়ার তা-ই হলো। প্রস্তাব এবং জবাব *না*। অবশ্যই ভদ্রভাবে। তাকে ধন্যবাদ। সম্পর্ক এখনো আগের মতোই। অন্তত আমাদের বন্ধুত্বে কোনো ফাটল ধরেনি।

ভালোবাসা প্রকাশ আর সুপ্ত রাখা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। অনেকে প্রকাশ করাকে কৃতিত্ব মনে করেন আবার অনেকে ভালোবাসা অব্যক্ত রাখাই শ্রেয়তর মনে করেন। দুই পদ্ধতিতেই মানুষ সফল হয়েছে। দুদিকেই অগণিত উদাহরণ দাড় করানো যাবে। অনেকেই আমার নানান ভুল তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

কিন্তু ভুল আমার একটাই।

সে *না* বলেছে।

চট্টেশ্বরী রোড, চট্টগ্রাম থেকে

সন্দেহ

- সাথী

আমি যাকে নিয়ে এ লেখাটা লিখছি সে আমার স্বামী। আমার স্বামী দেশের বাইরে থাকে। দুই বছর হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমি তাকে খুব ভালোবাসি। এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে তার নিজের জীবনটাই বেশি প্রিয়। কিন্তু আমি আমার স্বামীকে আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি।

আমার স্বামীকে বিশ্বাস করি। আর বিশ্বাস করি বলেই আমার সব কথা তাকে বলেছিলাম।
আমার আম্মা বিয়ের সময় আমাকে বলেছিলেন স্বামী–স্ত্রীর মাঝে কোনো গোপনীয়তা থাকতে নেই।
এ কারণেই আমার স্বামীকে সব কথা খুলে বলেছিলাম।
আমার এক খালাতো ভাই ছিল যে ছোটবেলা থেকেই আমাকে ভালোবাসতো। কিন্তু তাকে কখনোই আমার প্রেমিক হিসেবে ভাবিনি। সব সময় তাকে আমার বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করতাম। ভাই তো ভাই–ই। সে কেন প্রেমিক হবে! আমার স্বামী আমার সেই ভাইকে নিয়ে আমাকে সন্দেহ করেছিল। এ নিয়ে আমাদের দুজনের মাঝে অনেক কথা কাটাকাটি হয়।
হয়তো তাকে বিশ্বাস করে ভুল করেছি। আমি ভেবে পাই না যাকে আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবাসি সে কিভাবে পারলো আমাকে সন্দেহ করতে। সে তো জানতো আমার হৃদয়ে যদি কারো জন্য এক ফোটা ভালোবাসা থেকে থাকে তা শুধু তারই জন্য। কতোটা ভালোবাসি আমি তাকে। তার তো এটুকু বোঝা উচিত বলেই তার দেয়া আঘাত সহ্য করতে পারি না। তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি, ভালোবাসবো আজীবন।
খোদার কাছে আমার একটাই চাওয়া, যতোদিন বেচে থাকবো ততোদিন যেন তাকে সুখী রাখতে পারি। তাকে ভালোবেসেই যেন মরতে পারি।

মাদারীপুর থেকে

ইচ্ছা

- নীলিমা

উহ্, বড্ড ঝামেলা! আমার একদম ইচ্ছা নেই ওদের সঙ্গে দেখা করার। নন্দিনীকে জানিয়ে দিলাম।
অবশ্য ইচ্ছা ওরও ছিল না। নতুন বাড়িতে আসার পর দেখি আমাদের সামনের বাসায় ব্যাচেলর থাকে। দূর থেকেই যা কথা হয়েছে। এখন ওরা দেখা করতে চায়। আমরা তো রাজি না। যাকে নিয়ে লিখছি সে এদের বন্ধু, বেড়াতে এসেছে। অবশ্য এদের একজনের ফোন নাম্বার রয়েছে। সেখানে কথা বলছি, এমন সময় সে বললো, *আমাদের সম্পর্কে আপনাদের কেমন ধারণা জানি না। তবে দেখা করেন, চ্যালেঞ্জ করছি, ধারণা পাল্টে যাবে।*
সে মেডিকাল স্টুডেন্ট। এ দুটো কারণে আমি রাজি হলাম। কেননা আমার খুব ইচ্ছা আমার একজন ফ্রেন্ড থাকবে যে মেডিকাল স্টুডেন্ট। বাসায় গিয়ে নন্দিনীকে বললাম দুজন মিলে ধানমন্ডি লেকে আসতে।
ওরা এলো।
মাত্র এক ঘন্টা কথা হলো। তারপরও প্রচণ্ড জড়তা ছিল আমার। চলে এলাম।
পরদিন আবার ধানমন্ডি লেকে। চেয়ার টেবিলে বসে টানা চার ঘন্টা আড্ডা।
অবাক লাগলো যখন সে বললো, এই গানগুলো আপনার পছন্দ? কেননা আমি গানের কিছুই বলিনি। আমার চেহারা দেখে সে বলে দিল কোন কোন গান আমার পছন্দ।
আড্ডাটা খুব ভালো লাগছিল। কারণ এভাবে আড্ডা দেয়া ছিল আমার জন্য প্রথম। কথা প্রসঙ্গে জানলাম, তার বাবা অসুস্থ। অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছেন নয় মাস। তার প্রতি ওই মুহূর্তে একটা সফট কর্নার তৈরি হলো। আমি জানি এই অসুখের ভয়াবহতা। একই অসুখে মারা গেছে আমার প্রিয়জন। খুব ইচ্ছা হচ্ছিল এবার তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার। আমি জানি তার বাবা বাচবেন না। আর মৃত্যু কতোটা যন্ত্রণাদায়ক আমি জানি। তাই বিদায় মুহূর্তে তাকে ডেকে বললাম, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাই ভাই, বোন বা বন্ধু যেভাবে আপনি চান। এদের সঙ্গে যোগাযোগ থাক বা না থাক।
সে তার ফোন নাম্বার দিল। বললো, অবশ্যই।
এভাবেই শুরু।

তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের শুরুটাই ছিল অসুখ দিয়ে। দুই পরিবার যার ভুক্তভোগী। তারপরও কম ফোন করেছি, সে না অন্য কিছু ভেবে বসে। শুনলাম তার বাবা মারা গেছেন। তখন খুব খারাপ লাগছিল, যদিও জানি এটাই ছিল স্বাভাবিক। তারচেয়েও বেশি খারাপ লাগলো যখন দেখলাম তার বন্ধুরা তার কাছে একবারও গেল না। এমনকি নিয়মিত তার খোজও রাখছে না। মনে হলো এবার আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল। আমি নিয়মিত তার খোজ নিতে থাকলাম। প্রায় প্রতিদিনই তার সঙ্গে যোগাযোগ করছি। তার কষ্টটা একটু হালকা করতে চাইছি। অবাক লাগছে, মাত্র দুই দিনের দেখা একজনের জন্য আমার এত কেন সহানুভূতি, কষ্ট। কারণ মৃত্যুর হিম শীতলতা আমি জানি। এটাই ছিল আমাদের দ্বিতীয় মিল।

তাকে বার বার ঢাকা আসতে বললাম। কেন যেন মন বলছিল তার এখানে এলে ভালো লাগবে।

এলো।

দেড় মাস পর তাকে দেখলাম। প্রাণবন্ত সেই মানুষটি কেমন যেন শুকনো ফুলের মতো হয়ে গেছে। এর মাঝে আমি না বুঝে একটা অন্যায় করে ফেলি।

এতে সে বেশ রাগ করে বলে, আর কোনোদিন আসবে না।

এ কথা শুনে কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু সামনে ওর বন্ধুরা, কাদতে পারছি না। কান্না আটকে রাখতে গিয়ে গলা ব্যথা হয়ে গেছে। বার বার সবাইকে বলতে থাকলাম তাকে একটু বোঝাতে।

পরদিন যখন এলো, আমি গিয়ে বললাম, ডিসিশন কি পাল্টানো যায় না?

না পাল্টালে এলাম কিভাবে? পাল্টা প্রশ্ন।

দুজনই হেসে ফেললাম। এবার সত্যি তাকে পেলাম। এতোদিন মনে হতো কেবল আমাকেই সে পেয়েছে, তাকে আমি পাইনি। আর সেই থেকেই শুরু।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা চলছি এক সঙ্গে দুজনের সব কিছু দুজন শেয়ার করছি। আজ আমি তার যতো ভালো বন্ধু তারচেয়ে অনেক বেশি ভালো বন্ধু সে আমার। আমাদের দেখা হয় খুব কম। এই তো এবার চার মাস পর দেখা হলো। তারপরও সব সময় যোগাযোগ রয়েছে। কি করছি, কি করতে যাচ্ছি সব কিছু তাকে জানিয়ে দিই। সেও আমাকে জানাচ্ছে।

তার সঙ্গে যতো চলছি ততো মুগ্ধ হচ্ছি। এতো ভালো মানুষ কিভাবে হয়? মনে হতে পারে আমি মোহাচ্ছন্ন। কিন্তু তা নয়। তার বাস্তবের পদচারণায় তাকে অন্য সবার চেয়ে আলাদা করে রাখছে।

আমার দেখা তিনজন সেরা পুরুষের মাঝে সে একজন। তার মাঝে রয়েছে অনেক ভালো গুণের সমাবেশ যার একটাও যদি আমার মাঝে থাকতো, আমি গর্ব করতাম। তার কাছ থেকে শিখছি মানবিক গুণাবলীর চর্চা। তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে এমন মানুষের সাথেও তার ব্যবহার প্রাণবন্ত যেন তার বন্ধু। এমন ব্যবহারে সেই মানুষটাই অনুতপ্ত হচ্ছে কেন এমন ছেলের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলাম। অসাধারণ ভালো ব্যবহার দিয়েও প্রতিশোধ নেয়া যায়। এটা তার মত।

মনে হচ্ছে আমি তোষামোদ করছি। না তা নয়, তার মাত্র একটি গুণের প্রশংসা করেছি মাত্র। এ রকম হাজারো গুণ তার মাঝে রয়েছে। সন্তান, ভাই, স্টুডেন্ট, টিচার, বন্ধু, সর্বোপরি একজন মানুষ হিসেবে অসাধারণ। এও জানি, সে ভবিষ্যতে খুব ভালো ডাক্তার হবে। বন্ধু তুমি অনেক বড় হও।

তার একটা খারাপ গুণ রয়েছে যা না বলে পারছি না। সে স্মোকার। অনেক চেষ্টা করেও তাকে এ পথ থেকে দূরে সরাতে পারিনি। আমার কথায় সে কমিয়েছে মাত্র। এখন আর নিষেধ করি না। বলি, অল্প স্মোক করো। কারণ বুঝেছি, যে মানুষ তার থেকে একে আলাদা করতে পারবে সে আমি না, অন্য কেউ।

আমি জানি আর মানি, বন্ধুত্বের চেয়ে বড় সম্পর্ক হয় না। এর কাছে প্রেম কিছুই না। আজ আমার একটা ভয় কাজ করে, তাকে হারানোর। মাঝে মধ্যে ইচ্ছা হয় ওকে সারা জীবন আমার সঙ্গে রাখার। হবে না কেন? যে আমার সব কিছু জানছে, আমার হাসি-কান্না শেয়ার করছে, কারণে-অকারণে কথা হচ্ছে, আমার প্রতিটি

ব্যাপারে খোজ রাখছে, সব সময় আমার পাশে থাকছে, একইভাবে যার সাফল্যে আমার আত্মা গর্বিত হচ্ছে, যার দুঃখে আমাকে দুঃখী করছে তার সঙ্গে কি সারা জীবন থাকার ইচ্ছা হবে না?

হাতিরপুল, ঢাকা থেকে

মায়া

এক শীতের সন্ধ্যায় আমি ও সে বসে আছি খুব কাছাকাছি। চিরাচরিত ব্যাপার হিসেবে আমার হাত ও পা শীতে এবং ঠাণ্ডায় জমে বরফের চাই হয়ে আছে। তাকে বললাম, আমার হাতগুলো একটু গরম করে দাও না।
সে বললো, পারবো না।
দাও না, প্লিজ।
উফ! তোমার হাত যে কেন এতো ঠাণ্ডা হয়। আমি এমন বিরক্তিকর মানুষ দেখিনি।
বকলেই কপট রাগের ভঙ্গিতে আমার ঠাণ্ডা হিম শীতল হাত দুটোকে তার দুটো কোমল হাত দিয়ে জড়িয়ে নিল পরম মমতায় ও উষ্ণতায়।
আহ! কি শান্তি! আমার হৃদয়ের অলিতে-গলিতে যেন সুখের ঝড় বইতে লাগলো। এ সুখের জন্ম কোথায়? নিশ্চয় কোনো এক অদেখা জগতে এর জন্ম! পৃথিবীর গতি স্তব্ধ হয়ে যাক। আমি আর কিছু চাই না।
উপরের ঘটনাটা আমার স্মৃতির লাইব্রেরিতে সাজিয়ে রাখা খুব ক্ষুদ্র একটা স্মৃতি। আমি যে কেন এতো অস্বাভাবিক! যখন একা হয়ে যাই, আমার চোখের সামনে এ রকম হাজার হাজার স্মৃতি একের পর এক ভেসে আসতে থাকে। অস্থির লাগাটা আবার শুরু হয়। হঠাৎ করেই মনের সব ফুরফুরে আমেজ চলে যায়। গাঢ় বিষাদে আক্রান্ত হই।
ছোটবেলা থেকেই আমি কেমন যেন চুপচাপ এবং অসামাজিক। এক কথায় উদাসীন, ছন্নছাড়া, ভবঘুরে এবং ভাবুক টাইপের। আমার জীবনে প্রেম আসবে কি না তা ঠিক করতে সৃষ্টিকর্তাও সম্ভবত দ্বিধা করেছিলেন।
সে আমার ক্লাসমেট। তাকে প্রথম দেখি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময়। মুহূর্তেই মনে হলো আমার সমস্ত সত্তা যেন প্রচণ্ড ঝাকি খেল।
আমি বুঝতেও পারিনি প্রচণ্ড এক ঝড়ে আমার সব কিছু ওলোট-পালোট হতে যাচ্ছে। জীবনানন্দের বনলতাকে কখনো দেখিনি। কিন্তু বনলতাকে তার সামনে তুচ্ছ লাগলো। মনে হলো এই তো আমার স্বপ্নের নারী। কতোদিন, কতো রাত মনে মনে খুজেছি তাকে। তার চোখ ছিল খুব বড় বড় এবং মায়া ভরা। তার ঠোট ছিল খুব সুন্দর এবং ছিল অপূর্ব সুরেলা মিষ্টি কণ্ঠস্বর। যখন সে কথা বলতো, আমি যেন কাচের চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ শুনতে পেতাম। আমার অজান্তেই আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ স্বত্ব তার নামে লিখে দিয়ে দেউলিয়া হয়ে বসে রইলাম।
তার চোখে তাকিয়ে থাকতাম ক্লাসে, আড্ডায়, হাসি-ঠাট্টায়। তার এক্সপ্রেশনগুলো ছিল খুবই চমৎকার। তার চোখে আবিষ্কার করেছিলাম মায়ার সমুদ্র। কিন্তু সে এগুলো কিছুই জানতো না।
অতঃপর এক বন্ধুর মধ্যস্থতায় ও অতি উৎসাহে প্রেম নিবেদন করলাম এবং প্রত্যাখ্যাত হলাম।
আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো দুটো জিনিস। তার হাত ধরে বসে থাকা এবং চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকার কম্পিটিশন দেয়া। ও সব সময় আমার সঙ্গে চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকার কম্পিটিশনে হেরে যেতো। শুধু ভাবতাম তার চোখে এতো মায়া কেন?
তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে ছোট খাটো ও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া হতো। কিন্তু সমঝোতার ক্ষেত্রে সে কখনো নিজের অবস্থান থেকে এক চুল নড়তো না। সে কখনো নিজের সমালোচনা সহ্য করতে পারতো না। এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি যদি ভুলও হয় তা পরিবর্তন করে কার সাধ্য!

সে একটু একরোখা ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে ছিল অদ্ভূত এক সরলতা এবং শিশুদের মতো মুগ্ধতা যা আজও আমাকে মধুর আবেশ মাখা ফুরফুরে আমেজ এনে দেয়। আমি এই বদরাগী, একরোখা, রগচটা এবং স্বেচ্ছাচারী মেয়েটাকে ভালোবাসতে পেরে ভীষণ সুখী ছিলাম।

কিন্তু আবেগ দিয়ে যে নিয়তি পরিবর্তন করা যায় না তা জানতাম না।

সে আমাকে মাঝে মধ্যে বলতো, তোমাকে আমার খুব ভালোবাসতে ইচ্ছা করে।

জানতাম না যে সে এতো সত্যবাদী। জানলে হয়তো এ কথার গূঢ় তাৎপর্য খুজে বের করতাম। এটাও জানতাম না, সে আমাকে মেনে নিতে পারেনি মন থেকে। ভেবে আশ্চর্য হই, কি দুর্ভাগ্যজনক সিচুয়েশন সে পার করেছে। আমার বিষয়ে তার কিছু অপ্রাপ্তি ছিল। কিন্তু ভেবেছিলাম হয়তো সে মেনে নিয়েছে সেগুলো। না হলে আমার সঙ্গে সম্পর্ক করতো না।

রোম যখন পুড়ছিল নীরো তখন বাশি বাজাচ্ছিল এই প্রবাদের মতো আমি যখন খুব সুখী তখন যে আমার মনটাই ধ্বংস হতে যাচ্ছে তা বুঝিনি। পর পর বেশ কয়েকটি তুচ্ছ ঘটনার (যা তার জন্য অনেক বড় ঘটনা) রেশ টেনে সে সম্পর্ক ছেদ করতে চাইলো। আমার অনেক ত্রুটি ছিল। কিন্তু সম্পর্কচ্ছেদের জন্য সেগুলো যথেষ্ট ছিল না। বাদী পক্ষ যখন নিজেই বিচারক তখন বিবাদী পক্ষের ভরসা কোথায়!

কোনোভাবেই তাকে ফেরাতে পারলাম না। সে একটা জিনিস ভালো পারতো। কাউকে তীব্রভাবে অপমান করা। আমার ওপরে সুচারুরূপে সে এ বিদ্যা প্রয়োগ করলো। এমন অপমান যে এখনো ভাত খেতে গেলে মনে হয় ভাত তিতা লাগছে।

সে আমাকে বেশ কিছু কথা শুনিয়েছে। তার মধ্যে দুটো কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। সে দুটো হলো:

এক. তুমি যদি আরেকটু লম্বা হতে তাহলে আমি তোমার কাছে ছুটে, ছু–উ–উ–টে আসতাম।

দুই. তোমার কথা শুনে আমার কোনো ফিলিংস হচ্ছে না। শুধু মায়া হচ্ছে।

আমার উচ্চতা পাচ ফিট পাচ ইঞ্চি।

কোনো এক বিচিত্র কারণে মেয়েরা লম্বা ছেলে পছন্দ করে।

আমি মাঝে মধ্যে স্বপ্ন দেখি। আমি আরো লম্বা হচ্ছি এবং আমার প্রিয়তমা আমার দিকে স্লো মোশনে ছু–উ–উ–টে আসছে।

একটা স্মৃতি বলেই শেষ করবো। একদিন সন্ধ্যায় অডিটোরিয়ামে ফিল্ম শোতে গিয়েছিলাম তার সঙ্গে। কিন্তু প্রচণ্ড গরম, ঘামের ভ্যাপসা গন্ধ, চিৎকার, অস্পষ্ট ছবি এবং শব্দ ইত্যাদি কারণে তাকে নিয়ে বাইরে বের হলাম। প্রথমে তাকে নিয়ে শহীদ মিনারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

সে বার বার কোনোখানে তাড়াতাড়ি বসতে বলছিল। তার কণ্ঠে রাগ, ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছিল।

শহীদ মিনারে বসতে না বসতেই বললো, লাইব্রেরিতে যাবো।

কিছু বুঝলাম না। গেলাম লাইব্রেরিতে। সংশপ্তকের পেছনে হেলান দিলাম, সে আমার হাটুতে মাথা দিয়ে শুলো এবং প্রচণ্ড ব্যথায় সাপের মতো মোচড়াতে লাগলো। তখন বুঝলাম তার পিরিয়ডের ব্যথা শুরু হয়েছে। তার প্রচণ্ড কষ্ট দেখে আমার খুব মায়া হচ্ছিল। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। রুমাল দিয়ে বাতাস করছিলাম। এছাড়া আর কিই–বা করতে পারি? কিন্তু তার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছিল তার জন্য কিছু করি।

শুয়ে থেকে অনেকক্ষণ পর তার ব্যথা কমলো, একটু সুস্থ হলো। তখনও খুব লজ্জা পাচ্ছিল তার দুরবস্থার কথা ভেবে। কিন্তু আমি অন্য কিছু ভাবছিলাম না। শুধু মায়া হচ্ছিল। আমার সেবা শুশ্রূষা নাকি তার খুব ভালো লেগেছিল। পরে তাকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলাম।

আমি সেদিন তার প্রতি মায়া অনুভব করেছিলাম এবং সেও এখন আমার প্রতি মায়া অনুভব করে। কিন্তু কতোই না পার্থক্য এ দুই মায়া–র ভেতরে!

নাম বিহীন
জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে

পাথর চাপা

চাকরির সুবাদে সিনিয়র কলিগের সাথে প্রেম হয় এবং দুই পক্ষের অভিভাবকের অমতে আমরা লুকিয়ে বিয়ে করি এবং পরবর্তীকালে আমাদের বাবা মাকে না জানিয়ে স্বামীর প্রচণ্ড ইচ্ছার কারণে তাদের বাসায় গিয়ে উঠি। মন থেকে না হলেও তারা আমাকে কোনো রকমে মেনে নেন। শ্বশুর–শাশুড়ির অবহেলার মাঝেও নিজেকে অসম্ভব সুখী মনে হতো স্বামীর প্রচণ্ড ভালোবাসার কারণে।

এক বছরের মধ্যে আমার প্রথম সন্তানের জন্ম হয় এবং এর এক বছর পর ওর ভাইবোনদের মধ্যে বনিবনার কারণে আমাদের আলাদা করে দেয়া হয়।

নিজেদের সংসারে আমরা সুখেই ছিলাম। শুধু মাঝে মধ্যে সবার সঙ্গে এক সঙ্গে থাকতে পারলাম না এই কষ্ট আমার মধ্যে ছিল।

যাই হোক। যে কথা জানানোর জন্য আমার এই লেখা। নতুন বাড়িতে আসার আড়াই বছরের মধ্যে একদিন আমার সতেরো আঠারো বছরের কাজের মেয়ের শরীর বেশ কিছু দিন থেকে খারাপ যাচ্ছে। কিছু খেতে পারে না আর ওর মাসিক হচ্ছে না। ওকে গাইনি ডাক্তার দেখালাম। ডাক্তার পরীক্ষা করেই বললো, ছয় মাসের অন্তঃসত্তা।

শুনে ঘাবড়ে গেলাম।

কিভাবে হলো?

এই অবস্থায় কি করবো?

তখন আমার স্বামীও দেশে নেই।

ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিভাবে হলো কার সঙ্গে সম্পর্ক।

ও কোনো কথার উত্তর দেয় না।

ভাবলাম হয়তো আমাদের দারোয়ান বা ড্রাইভারের সঙ্গে সম্পর্ক হতে পারে। অনেক সময় ওকে সারা দিনের জন্য বাসায় একা রেখে আমরা বাইরে থাকি। হয়তো ওই সময়ের ঘটনা।

যখন ওকে আবার ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি কথা না বললে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো তখন আমার পায়ে ধরে সে বললো, আমাকে বাড়িতে পাঠাবেন না। এই অবস্থায় আমার আব্বা আমাকে মেরে ফেলবেন।

গত এক বছরের মধ্যে ও বাড়িতেও যায়নি।

বাড়িতে পাঠানোর কথা শোনার পর ও বললো, এই বাসার খালু ওর এই অবস্থা করেছে। অর্থাৎ আমার স্বামী!

তার কথা শুনে আমার পুরো শরীর অবশ মনে হচ্ছিল এবং আস্তে আস্তে আমার পায়ের নিচের মাটিগুলো সরে যাচ্ছে। কোনোমতে নিজেকে সামলিয়ে রুমে এসে বসলাম। আমার এখনো ওর কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না। হয়তো ও কোনো সুবিধা আদায়ের জন্য আমার স্বামীর ওপর দোষ চাপাচ্ছে। কারণ ও দেখতে ভালো নয়। আমার স্বামী যে চাকরি করেন তার চারপাশে প্রচুর সুন্দরী মহিলা এবং চাকরির সুবাদে তাকে প্রচুর দেশ–বিদেশ ভ্রমণ করতে হয়। এতো সুযোগ থাকতে ও যে একটা কাজের মেয়ের প্রতি আসক্ত হবে, এই অভিযোগ মেনে নিতে পারলাম না।

যখন ওকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম তখনো একটা পর একটা ঘটনার বর্ণনা দিতে লাগলো। যা কিছু কিছু বর্ণনার সঙ্গে মিলে যেতে লাগলো। কারণ রাতে শোয়ার পর প্রায়ই আমার স্বামী উঠে চলে যেতো। বলতো, ঘুম আসছে না, যাই টিভি দেখি। আমার প্রায়ই মনে হতো আট, দশ দিন পর বাড়িতে এসেও টিভি দেখার নেশা।

এ কথাই কাজের মেয়ে বললো। সে রাত উঠে এসে ওকে নিয়ে ভিসিআর–এ সেক্স মুভি দেখতো। বাইরে থেকে আনা সেই সব ক্যাসেট দেখার পর তারা দুজনে মিলিত হতো। যখন বাচ্চাকে নিয়ে সকালে স্কুলে থাকতাম তখন ওরা এক সঙ্গে আমার বেডরুমে থাকতো। আমাদের কিছু দিনের জন্য লন্ডনে ওর এক আত্মীয়র বাসায় রেখে এসেছিল। তখন ওরা ঢাকায় অঘোষিত স্বামী–স্ত্রীর মতোই ছিল।

এভাবে প্রায়ই ওরা এক সঙ্গে থাকতো যা কোনোদিন একটু কিছু বুঝতে পারিনি। মাঝে মধ্যে আমার স্বামীর দুই একটা কাজ বা কথাবার্তায় একটু অন্য রকম মনে হতো। কিন্তু আমার স্বামীকে এতো বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতাম যে, কোনোদিন এই নোংরা চিন্তা আমার মনে আসেনি।

কাজের মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক? এটা অসম্ভব!

ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা কাজের মেয়েকে পরিচিত ডাক্তারের মাধ্যমে ক্লিনিকে ভর্তি করালাম।

ডাক্তার বললো, ছয় মাসের বাচ্চা, এটা নষ্ট করা যাবে না। ডেলিভারি করাতে হবে। এতে খরচ ও ঝুকি দুই আছে।

অবশেষে তিন দিন পরে জীবনের ঝুকি নিয়ে দুই ব্যাগ রক্ত দিয়ে সুন্দর ফুটফুটে একটা ছেলে সন্তানের জন্ম দিল।

যেহেতু আমরা বাচ্চাটা চাইনা তাই কোনো রকম যত্নের অভাবে বাচ্চাটা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেল।

এই ঘটনার একদিন পরে বিদেশ থেকে আমার স্বামী বাসায় এলো এবং কাজের মেয়েকে না দেখে জানতে চাইলো, ও কোথায়?

যখন কাজের মেয়ের প্রেগনান্সির কথা, ওর কষ্টকর ডেলিভারির কথা বললাম, সে এমন ভাব করলো যেন কিছুই জানে না। ওকে খুব অস্থির মনে হলো। অথচ তার মধ্যে কোনো অপরাধ বোধ, লজ্জা কিছুই প্রকাশ পেল না।

কিন্তু তার এই পাপের জন্য সর্বোপরি কাজের মেয়েকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং নিস্পাপ বাচ্চাটাকে পৃথিবীর আলো দেখতে না দেয়ার এই অপরাধ বোধ আজও আমাকে কষ্ট দেয়। এভাবে তার এতো বড় পাপ কাজ নিজের বুকে পাথর চাপা দিয়ে আমার স্বামীকে রক্ষা করলাম। এবং কাজের মেয়ের সেবা–যত্ন করে কয়েকদিন পর বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম শুধু এই ভেবে যে, আমার স্বামী হয়তো একটা ভুল করে ফেলেছে।

আস্তে আস্তে নিজের মনকে যখনই একটু সেটল করে নিলাম তখনই আবারও একই ঘটনা। যদিও ওই ঘটনাটিও আমার কাছে অস্বীকার করেছিল। তবু ওর কথাবার্তায় এবং আচরণে বুঝে ছিলাম এটা ওরই কাজ ছিল।

এর মধ্যে বেশ কয়েকটা কাজের মেয়ে, মহিলা বদল করেছি। কারণ তাদেরও একই কমপ্লেইন, সাহেবের নজর ভালো না। আমি বাসায় না থাকলে তাদের বিরক্ত কারে। রুমে ডাকে। এছাড়া প্রায়ই রাতে আমি ঘুমিয়ে গেলে ওদের কাছে উঠে আসে। যারা একটু ভালে স্বভাবের ছিল তারা কাজ করবে না বলে চলে যেতো।

এ রকম একটা নোংরা রুচির লোকের সঙ্গে এতোটা বছর বসবাস করে নিজেই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে গেছি। এখন আমার নিজের ওপর ঘৃণা হয়। ও যখন আমাকে ছোয়, আদর করার ভান করে তখন নিজেকে ওই কাজের মেয়েদের মতো মনে হয় যে ওদের সঙ্গেও এভাবে ভালোবাসার খেলার অভিনয় করতো।

আসলে ওর মনে ভালোবাসা বলে কিছু নেই। শুধু নারীদের শরীর নিয়ে খেলা করতে জানে যা আমার মতো একটা সাধারণ মেয়ে এই ভণ্ডামি বুঝতে পারিনি। অথচ এই আমি আমার স্বামীর ভালোবাসায় নিজেকে পূর্ণ মনে করে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল তারচেয়ে এখন বেশি ঘৃণা ও অসম্মান নিয়ে তার সঙ্গে সংসার করে যাচ্ছি, শুধু আমার দুটো অবুঝ সন্তানের মুখ চেয়ে। এবং নিজেও যে এতো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মাঝে মধ্যে মনে হয় আত্মহত্যা করি। কিন্তু পারি না।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

তাদের কথা

- কামরুল হাসান

আজকের এই সুন্দর ও পবিত্র দিনে আমি তাদের কথা বলবো। আমার বাবা আর মার কথা। আমার বাবার সাথে আমার মায়ের যখন বিয়ে হয়, মা তখন কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়ালের ছাত্রী এবং বাবা কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতিতে এমএ পড়ছেন। বেশ অনেকটা ব্যবধান।

জ্ঞান হবার পর থেকে দেখে আসছি, আমার মা অত্যন্ত সুদক্ষ, গোছানো, সুরুচি সম্পন্ন একজন আধুনিক গৃহিণী যিনি পুরো পরিবারটিকে সুচারু রূপে চালান। আমার বাবা মায়ের মিষ্টি মধুর দাম্পত্য জীবন চিত্র এখনো আমার চোখে ভাসে।

আব্বা সকালে উঠে ফজরের নামাজের পর কোরআন তেলাওয়াত করে মওলানা মোহাম্মদ আলীর ইংলিশ ট্রানস্লেশনটা একটু পড়তেন। এটা তার চিরদিনের অভ্যাস।

আম্মা সকালের নাস্তা পর্ব সেরে আলমারি থেকে আব্বার কাপড় বের করতেন। আব্বা কোন শার্টের সঙ্গে কোন প্যান্ট পরে অফিসে যাবেন, আম্মা ঠিক করে দিতেন। আব্বার পোশাক পাল্টানো ও চুল আচড়ানোর পর আব্বার বুক পকেটে কলমটা আম্মা গুজে দিতেন এবং ঘড়িটা এগিয়ে দিতেন। কাজের লোককে পাঠিয়ে দিতেন একটা রিকশা ঠিক করে আনার জন্য। রিকশা এসে গেলে আব্বার হাতে লাঞ্চ বাক্সটা তুলে দিয়ে জানালায় দাড়াতেন আম্মা। যতোক্ষণ আব্বার রিকশা চোখের আড়াল না হতো, আম্মা জানালায় দাড়িয়ে থাকতেন। আব্বা অফিসে চলে যাবার পর শুরু হতো আম্মার সাংসারিক নিত্যদিনের কাজ।

আমি যখনকার কথা বলছি সেটা স্বাধীনতার আগে ঢাকা শহরের একজন সরকারি অফিসারের মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের নিত্যদিনের গল্প। আব্বা মাস শেষে বেতনের পুরো টাকাটা আম্মার হাতে তুলে দিয়ে এক রকম নিশ্চিন্ত থাকতেন।

আম্মা দুধওয়ালা, কাগজওয়ালা, আমাদের স্কুলের বেতন, বুয়ার বেতন, প্রতিদিনকার বাজার খরচ সব কিছু মিটিয়ে সুন্দর করে সব হিসাবের খাতায় লিখে রাখতেন।

মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে বলতাম, আম্মা, কষ্ট করে এতো সব লেখার কি দরকার?

আম্মা হেসে বলতেন, কোন মাসে কতো খরচ হচ্ছে একটা হিসাব থাকে।

আজ আমার সংসার জীবনে গিন্নি যখন ব্যাংক স্টেটমেন্ট নিয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে তখনো বিরক্ত হয়ে বলি, যেটা খরচ হবার হয়ে গেছে।

ও মুখ ভারী করে বলে, দেখি এ মাসে কতো খরচ হলো।

আব্বাকে সঙ্গে করে মাসে একবার শপিংয়ে যেতেন আমার শৌখিন মা। মনে পড়ে, তখনকার দিনে আমাদের প্রতিবেশী খুব কম মহিলাই শপিংয়ে যেতেন। বাড়ির কর্তাই সব সারতেন। এমনকি ঈদ শপিংটাও। তখনকার নিউ মার্কেট, বায়তুল মোকাররাম, গুলিস্তান এবং জিন্নাহ এভিনিয়ের গ্যানিস (তখনকার ঢাকায় একমাত্র ডিপার্টমেন্ট স্টোর) থেকে শপিং করে ফিরতেন। মাঝে মাঝে ইসলামপুরের সোনার দোকানে যেতেন। ফিরে এসে বলতেন টুকটাক সোনা কিনে রাখছি। আমার তো মেয়ে আছে, কাজে লাগবে।

আব্বাকে কখনোই দেখিনি আম্মার সঙ্গে দ্বিমত করতে। আব্বার খুব বিশ্বাস ও আস্থা ছিল আম্মার ওপর। এখন বুঝি দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং আস্থাটা কতো প্রয়োজনীয়। আমার মাকেও দেখিনি আব্বার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু নিয়ে অযথা বায়না ধরতে। আর আমরা ভাইবোনেরা কখনো আব্বার কাছে কিছু চাইতাম না। ভালো করেই জানতাম টাকা পয়সা তো মায়ের হাতে।

আম্মা পরামর্শ দিতেন আব্বাকে বাড়ি তৈরি করবেন, বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে, মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়বে, ছোট ছেলে ডাক্তারি পড়বে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা ও ভালোবাসায় জড়ানো একটি সুন্দর গোছানো পরিপাটি সংসার।

মনে পড়ে, অতিথিরা যে কেউ আমাদের বাসায় এলে মুগ্ধ হতেন। পরিষ্কার সুন্দর করে গোছানো ঘরবাড়ি, রুচিশীল আসবাবপত্র, ম্যাচ করা পর্দা, আম্মার এমব্রয়ডারি করা টেবিল ক্লথ, সোফা ব্যাক, সাজানো বেডরুম, এমনকি রান্নাঘর। কোথায় না আমার মায়ের হাতের ছাপ নেই!

স্বাধীনতার বেশ কিছু দিন পর আব্বা সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিলেন। আমরা বাড়ি করে সরকারি বাসা ছেড়ে নতুন বাড়িতে উঠলাম। ভাইয়া বুয়েট থেকে পাস করে বিদেশে চাকরি করছেন। ছোট আপা ইউনিভার্সিটির পাঠ শেষে একটা স্কুলে জয়েন করেছেন। বড় আপাদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোটরা কলেজে পড়ছে।

আব্বার অবসর জীবনের সঙ্গে আম্মারও পরিবর্তন। আম্মার আগের সেই স্মার্টনেসটা নেই। কিছুটা অন্য রকম। তবুও দিন থেমে থাকে না। দিন চলে যাচ্ছিল।

আমি ডাক্তারি পাশ করে চাকরি নিয়ে বাইরে চলে এলাম। দেশে ছুটি কাটিয়ে ফিরে এসেই খবর পেলাম আম্মার স্ট্রোক হয়েছে। আম্মা হাসপাতালে। পুরো পরিবারটিই ভেঙে পড়লো। আম্মা হয়তো আর ফিরবেন না। অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন।

একদিন রাত দুটোয় হাসপাতাল থেকে ফোন এলো পেশেন্টের অবস্থা খুব খারাপ। রাতটা পার হবে কি না খোদা জানে।

ভাইয়া হাসপাতালে ছুটে গেলেন।

আব্বা অসুস্থ। আর্থরাইটিসের ব্যথায় হাটতে পারছেন না। হাসপাতালে যেতে পারলেন না সেই রাতে। খুব শান্তভাবে ওজু করে জায়নামাজ নিয়ে বসে পড়লেন। সারা রাত নামাজ পড়ে ভোররাতে আল্লাহপাকের দরবারে আরজ করলেন, হে পাক পরওয়ারদেগার, তুমি আমাকে নিয়ে নাও, আমার জীবনের বিনিময়ে ওদের মাকে ফিরিয়ে দাও।

কি আশ্চর্য প্রার্থনা, কি আশ্চর্য নিবেদন এবং ভালোবাসা। আমার মা আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠলেন। যে মানুষটি স্ট্রোকের পর কাউকে চিনতে পারতেন না, কথা বলতে পারতেন না, খেতে পারতেন না, বেডপ্যান ব্যবহার করতেন, এমনকি কাপড়টাও ঠিক রাখতে পারতেন না তিনি অবিশ্বাস্যভাবে ভালো হয়ে উঠলেন মাত্র তিন সপ্তাহের মাথায়। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স সবাইকে অবাক করে মা তিন সপ্তাহ পর বাসায় ফিরে এলেন। দুর্বল। তবুও নিজে তুলে খেতে পারেন, কথা বলতে পারেন, সবাইকে চিনতে পারছেন। একা বাথরুমে যেতে পারছেন কারো সাহায্য ছাড়া। আস্তে আস্তে আরো সুস্থ হয়ে উঠছেন।

আম্মা ফিরে আসার ঠিক তিন মাসের মাথায় আব্বা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দুদিনের অসুস্থতায় সেই একই হাসপাতালে ভোরে ঘুমের মাঝে আমাদের আব্বা সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন।

আব্বা চলে যাবার পর আম্মা যে কয় বছর বেচে ছিলেন কোনোদিনও তার শখের বেডরুমের সাজানো পালঙ্কটিতে ঘুমাতেন না। মেঝেতে কার্পেটের ওপরই সারা দিন বসে থাকতেন। ওখানেই জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ আদায় করতেন। মাঝে মধ্যে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকতেন তার অতি শখের বার্মা টিকের নকশা করা সুন্দর পরিপাটি পালঙ্কটির দিকে।

ভালোবাসা দিনে মনে পড়ে আমার মা বাবাকে। মনে পড়ে তাদের ভালোবাসার কথা যে ভালোবাসা তারা পড়তেন চোখের ভাষায়। অনুভব করতেন হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে।

টরন্টো, কানাডা থেকে
quamrulhassan@hotmail.com

এক রজনী ও এক রমণী

- নজরুল পারভেজ

আমি একটা প্রাইভেট কম্পানিতে কর্মরত। কম্পানির কাজে যাচ্ছি চট্টগ্রাম। সেখান থেকে সন্দীপ। ঘড়ির কাটা বিকাল তিনটা ছুই ছুই করছে। দাড়িয়ে আছি কমলাপুর রেল স্টেশনের টিকেট কাউন্টারের সামনে। টিকেট মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা ভাই চট্টগ্রামের ট্রেন কয়টায়?

সে বললো, সাড়ে তিনটায়।

বললাম, শোভনের একটা টিকেট দিন।

দাড়িয়ে আছি তিন নং প্লাটফর্মে ট্রেনের অপেক্ষায়।

কিছুক্ষণ পর স্পিকারে ঘোষণা করলো, ট্রেন ছাড়তে এক ঘণ্টা দেরি হবে।

কিছুক্ষণ পায়চারী করে আবার গেলাম টিকেট কাউন্টারে। জিজ্ঞাসা করলাম, এখন চট্টগ্রামের আর কোনো ট্রেন নেই?

টিকেট মাস্টার বললো, চারটায় সুবর্ণা এক্সপ্রেস আছে।

তখনই মনস্থির করলাম মহানগরের টিকেট ফেরত দিয়ে সুবর্ণার টিকেট নেবো।

টিকেট নেবো ঠিক সে মুহূর্তে পেছন থেকে একটি রমনীর সুমধুর কণ্ঠ ভেসে এলো কানে, প্লিজ ভাই আমার জন্যও একটা টিকেট নিন। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটি সুন্দর, লম্বা এবং যথেষ্ট স্মার্ট। মনে মনে ভাবলাম ভ্রমণ সঙ্গী হিসেবে এমন রমণীর সঙ্গ কার না ভালো লাগে, মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবেন?

উত্তর, চট্টগ্রাম।

সেখানে কোথায়?

উত্তর, জানি না।

আশ্চর্য হলাম। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়র সূক্ষ্ম প্রয়োগ করে তার অন্তরের যাবতীয় ভাব অনুমান হলেও বুঝতে চেষ্টা করলাম। ফলাফল শূন্য। সন্দেহ আরো দানা বাধলো। অচেনা রমণীর সঙ্গ ভ্রমণকালে প্রত্যাশিত হলেও আমাদের দেশের সমকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচলিত হলাম সামান্য। কেমন জানি সন্দেহ আরো প্রকট হলো। কোন বিপদে পড়ি আল্লাহই জানে।

আবার ভাবলাম যেখানে যাবার সেখানে যাক আমার টাকাটা দিয়ে যে টিকেট নিয়েছি সে টাকাটা নিয়ে নিই, তারপর দেখা যাবে। মেয়েটিকে বললাম, টিকেটের টাকাটা দিন।

আমার কাছে ভাংতি টাকা নেই।

আমি সিগারেট কিনবো। মেয়েটি আনমনা হয়ে দাড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পর সে বললো, দুপুরে খাইনি চলুন কিছু খাই।

মেয়েটিকে বললাম, খাওয়ার আগে বলুন আপনি কেনো চট্টগ্রাম যাচ্ছেন?

মেয়েটি একটু আনমনা হয়ে উত্তর দিল, আমার মা আমার বিয়ে ঠিক করেছে। ছেলেটিকে আমার পছন্দ না। তাই বাসা থেকে পালিয়েছি।

মেয়েটির কথা কেন জানি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তার মা বিয়ে ঠিক করেছেন এটাকে না ঠেকিয়ে অনাগত দিনগুলোকে অনিশ্চয়তায় সমর্পণ করে এভাবে কোনো মেয়ে কি অজানা গন্তব্যের ঠিকানায় নিজেকে ঘরের বাইরে করতে পারে?

কথা বলতে বলতে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। খাওয়ার পর বিল দিতে যাবো মেয়েটি ব্যাগ থেকে টাকাটা বের করে বিল শোধ করে দিল।

সন্দেহ, সাহস, ভয় সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা অপূর্ব পরিস্থিতিতে এসে ঠেকলাম। তবে ঘাবড়ে গেলামই বেশি। তবুও মনে মনে সাহস সঞ্চার করে বললাম, সত্যিই কি তোমার বিয়ে ঠিক করেছে? তোমার বাড়ি কোথায়? তোমরা কয় ভাইবোন? ইত্যাদি।

মেয়েটি নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বললো, তার নাম মুক্তা। গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুর। ঢাকাতে জুরাইন থাকে। চার বোন, এক ভাই। বাবা বেচে নেই। মা যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছেন, ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর নয় তেমনি অশিক্ষিত।

সে আরো বললো, আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়ি। আমার এক বেয়াই আছে, তাকে ভালোবাসি। বেয়াই চট্টগ্রাম থাকে। তাকে খুজতে এসেছি। বাড়িতে থাকলে মা ওই ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবেন।

বললাম, কাজটা কি তোমার ঠিক হয়েছে? তুমি প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতে পারতে। তুমি একজন মেয়ে। তাছাড়া যে বয়স তাতে তুমি কয়দিন ঠিকানা বিহীন নিজেকে নিজের মতো করে ধরে রেখে ওকে খুজতে পারবে? তুমি জানোনা তোমার বেয়াই কোথায়, এসব কথার কি কোনো মানে হয়? থাক, সে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মেয়েটি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে আমাকে বললো, আপনি কি করেন?

মেয়েটিকে ভয় দেখানোর জন্য একটু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললাম, আমি যে কাজ করি তা সকলকে বলা যায় না। কারণ আমাদের, মানে আমি পুলিশের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চে আছি।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম। মনে হলো একটু ভয় পেয়েছে।

মেয়েটি এবার তাড়াতাড়ি তার ব্যাগ থেকে আমার টিকেটের টাকাটি বের করে দিল।

একজন আসামিকে রিমান্ডে নিলে যে রকম জিজ্ঞাসা করে আমিও সে রকম তাকে নানান প্রশ্ন করতে লাগলাম। সব প্রশ্নের ফাকে একটাই কথা, মা বিয়ে ঠিক করেছেন। তাই পালিয়েছি। আমি যে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চে আছি এটা বোঝানোর জন্য বললাম, আমরা কখনো সাংবাদিক, কখনো ফকির, কখনো স্টুডেন্ট। আমার মানিব্যাগ থেকে ইউনিভার্সিটির পুরনো কার্ডটি বের করে বললাম, আমি সাংবাদিক। আমাদের কম্পানীর কার্ডটি একটি দৈনিক পত্রিকার মনোগ্রামের মতো।

মেয়েটির দিকে তাকালাম, পুরো নিঃস্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি হাতজোড় করে বললো, আপনি আমার ভাইয়ের মতো, প্লিজ, আমাকে বাসায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না।

কিছুটা বুঝলাম যে, মেয়েটি বিশ্বাস করেছে আমি ডিবির লোক। আমি তো এবার বীর পুরুষ এটা-সেটা আরো কতো কি? তবুও ভেতরে ভেতরে কলিজাটা শুকিয়ে কাঠ। মেয়ে মানুষ বলে কথা। তার উপরে পাশাপাশি সিট।

ট্রেনে উঠে বসলাম।

জানালার পাশে সে বসেছে।

মেয়েটিকে বললাম, তোমার ব্যাগের মধ্যে অবৈধ কিছু নেই তো?

সে বললো, নেই।

বললাম, চেকিং করবো।

ব্যাগটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। চেইনটা খুলে দেখলাম প্রয়োজনীয় কাপড়–চোপড় ছাড়া অন্য কিছু নেই। এতো কিছু করতাম না যদি তার আর আমার সিট একই টিকেটে না হতো।

ট্রেন ছেড়েছে বেশ কিছু সময় হলো। ট্রেন থেকে পানির বোতল, চিপস, কেক, চুয়িংগাম ইত্যাদি নিলাম। নিজেও খেলাম, তাকেও দিলাম। বাথরুমে যাব সাহস পাচ্ছি না। এই সময় যদি পানির বোতলে, পানিতে কিছু মিশিয়ে দেয়! তবুও গেলাম বাথরুমে। কারণ জল বিয়োগ করা আমার অত্যাবশ্যকীয়। বাথরুম থেকে এসে পানির বোতল নিয়ে সামান্য পানি খেলাম। কারণ মেয়েটি যদি পানিতে কিছু মিশিয়ে দেয়, সামান্য খেলে তো বুঝতে পারবো।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে পানি খেলাম। যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকু। দেখলাম সব কিছু ঠিকঠাক।

রাত এগারোটায় চট্টগ্রাম এসে পৌছালো ট্রেন। ট্রেন থেকে নামার পর মানবিক কারণে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে এখন?

উত্তর, জানি না। মেয়েটি বললো, আপনার কোনো আত্মীয় নেই! বললাম, যারা আছে তারা শহর থেকে অনেক দূরে। এতো রাতে যাওয়া সম্ভব নয়।

মেয়েটি বললো, আপনি তাহলে কোথায় থাকবেন?

বললাম, হোটেলে। মেয়েটিকে বললাম তোমার যখন যাওয়ার কোনো জায়গা নেই আর আমাকে যখন ভাই ডেকেছো, আমার সঙ্গে হোটেলে নির্ভয়ে থাকতে পারো। তবে একটা শর্তে। কাল সকালের গাড়িতে ঢাকা চলে যাবে।

এ কথা বলার পর সে পিছু পিছু রওনা করলো।

প্রথমে একটা হোটেলে যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ বললো, রুম খালি নেই।

হয়তো বা আমাদের বয়স অনুমান করে আমাদেরকে রুম দেয়নি। আমার বয়স চব্বিশ, মেয়েটির বয়স ষোল অথবা সতেরো হবে।

এরপর গেলাম অন্য হোটেলে। সেখানে একটি মাত্র রুম খালি আছে। তাও বড় একটা খাট। কিভাবে শুই, পড়লাম আরেক বিপদে। মেয়েটিকে বললাম, তুমি ঘুমাও, আমি চেয়ারে বসেই রাতটা কাটিয়ে দেবো।

মেয়েটি কৃতজ্ঞতার সুরে বললো, আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন। আপনিই শোন, আমি বসেই রাতটা কাটিয়ে দেবো।

আমি যে ঘুমুবো সেই সাহসও পাচ্ছি না। কারণ ঘুমিয়ে থাকার সময় যদি আমার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়, কারণ আমার ব্যাগে প্রায় দশ হাজার টাকা ছিল।

এভাবে বসেই রইলাম।

আমার বসে থাকা দেখে মেয়েটি হোটেল বয়কে ডেকে বললো, একটা সিঙ্গল রুম হবে কি?

ভাগ্য ভালো সিঙ্গল রুম ছিল না। ভাগ্য ভালো এ জন্য বললাম, হোটেলে ভাই বোনের পরিচয় দিয়ে উঠেছি। মেয়েটি যদি সিঙ্গল রুম নিয়ে অন্য ঘরে থাকে তাহলে হোটেল কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করতে পারে। তার ওপর র‍্যাব যেভাবে নেমেছে। অনেক বুঝিয়ে–সুঝিয়ে তাকে রুমে বসিয়ে রাখলাম।

রাত আনুমানিক তিনটার দিকে দেখলাম মেয়েটি রুম থেকে বেরিয়ে হোটেলের বয়দের সঙ্গে কথা বলছে।

আমি করি কি? না পারি কিছু কইতে, না পারি সইতে। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। কারণ মেয়েটি যদি কোনো বাজে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাহলে আমি সোজা শ্রীঘরে। আমার গোয়েন্দগিরি?

মেয়েটিকে রুমে ডেকে এনে বললাম, তোমার আল্লাহর দোহাই লাগে প্লিজ রুম থেকে আর বের হবে না। সকাল হোক তারপর তোমার যা মন চায় তা করো।

রাত যেন শেষই হয় না। বহু কষ্টে রাতকে ভোর করলাম। সকাল ছয়টায় তাকে বললাম, চলো তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

সে বললো, আমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন। যেখানে আমার চাকরিই টলমল, তাকে দেবো কোথা থেকে অবশেষে তাকে বললাম, ঢাকা চলে যাও, আমি এলে একটা ব্যবস্থা হবে।

এ কথা বলার পর মেয়েটি বললো, আপনার মোবাইল নাম্বার দিয়ে যান। আমি পরে ঢাকা গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

আবার বললাম, চলো তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

মেয়েটি হোটেল থেকে বের না হয়ে বলে, আপনি যান, আমি পরে যাবো।

তাকে আমার নাম্বার না দিয়ে ভূয়া একটা নাম্বার দিয়ে চোরের মতো কেটে পড়ি। কারণ মেয়ে মানুষ বলে কথা আবার কোন বিপদে পড়ি তার কোনো ঠিক আছে?

এখন ভাবছি গোধূলী পেরিয়ে রাত তারপর ভোর এটা কি স্বপ্ন? যাই ভাবি এটা বাস্তব। মাঝে মধ্যে মানুষের জীবনকে একটা শাদা পৃষ্ঠা বলে মনে হয় আমার। এখানে থাকে দাগ, কষ্ট, বিরহ, আনন্দ–বেদনা, বিচ্ছেদের। জীবনের অনেক দূর পেরিয়ে কেবল মানুষই পারে তার ফেলে আসা দাগগুলোকে চোখ বুঝে সহজে ভাবতে, দেখতে। বাস্তবতার কারণে কখনো এতোই কঠিন, প্রয়োজনে কি নিষ্ঠুর না হতে হয় মানুষকে।

বেশ কয়েক মাস হয়েছে ঘটনাটি ঘটেছে। মানুষের নতুন স্মৃতিকে স্থান দিতে বিস্মৃতির প্রয়োজন হয়। এতোটা দিন পরেও সে ক্ষণিকের অকল্পনীয় ঘটনাটি মনে নাড়া দেয় বার বার। দিনের সমগ্র ব্যস্ততার যবনিকায় যখন নিজেকে এলিয়ে দিই তখন হৃদয়ের মাঝে এক ধরনের বেদনার সুর বেজে ওঠে। ভিজে আসতে চায় দু চোখের কোণ আপন মনে প্রশ্ন জাগে, এ কি কোনো আমার নিজস্ব অতীত পাপের ফল? নাকি নতুন কোনো পাপ? নাকি এভাবেই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয় জীবন নামের পান্থশালা, স্মৃতির ফ্রেমে বন্দী হয় এক একটি তিলক চিহ্ন।

নিজেকে অপরাধী মনে হয়। মেয়েটির সঙ্গে বিদায়ের সে মুহূর্তে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে আমি পরাজিত হয়েছি। নিজের মোবাইল নাম্বারটা না দিয়ে। অন্তত্য সামান্য অবস্থা জানতে পারতাম। সে মেয়েটির কি পরিণতি হয়েছিল। মেয়েটি যদি সত্যিই সে ছেলেকে ভালোবাসার কারণে ঘর ছাড়ে তবে বিধাতার কাছে আশা করবো, সে যেন অন্তত ভালোবাসার মানুষটিকে খুজে পায়। আর আমার লেখাটা যদি চোখে পড়ে তবে বলবো, আমাকে ক্ষমা করো।

মগবাজার, ঢাকা থেকে

রঙিন অতীত

- সুফিয়া জামান

১৯৭০ সালের বসন্তকাল। তখন ফুটেছিল শিমুল, ফুটেছিল পলাশ। ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল গাছ। বইছিল মিষ্টি বাতাস। গাছের পাতার সঙ্গে বাতাসের অবিরল ফিসফাস, কানাকানি। বাতাস কি কথা কয় কে জানে! সে কথা শুনে শুনে হিন্দোল বয়ে যেতো গাছের শাখা–প্রশাখায়। কি এক মাদকতায় আন্দোলিত হতো তার সারা দেহ। উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতো। বারে বারে যেন হতো শিহরিত। বসন্তকে স্বাগত জানাতে সেদিনও নতুন সাজে সেজেছিল প্রকৃতি। সাজ সাজ রব পড়েছিল চারদিকে। মানুষের সত্তায় প্রকৃতি মিশে আছে বলেই বসন্ত এলেই উচাটন হয়ে উঠে মানুষের মন। তাই তখন আমারও অজানা আবেগ, অচেনা আনন্দে নেচে উঠেছিল তনু মন। অদ্ভুত এক ভালো লাগা। এক স্ফুর্তি অবিরল খেলা করছিল আমার মনের বাড়িতে। কারণ তখন আমার বিয়ে হয়েছিল। বধূবেশে বরের পাশে বসে মনে হচ্ছিল আমার মতো সুখী আর কেউ নেই।

মমতাময়ী শ্বাশুড়ি অতি যত্নে বরণ করে ঘরে তুলে নিয়েছিলেন আমাকে। অতি দ্রুত সবার ভালোবাসার বাধনে বাধা পড়ে গেলাম আমি। মনে হচ্ছিল এটা যেন খুবই জরুরি একটা অধ্যায়। তারপর আমার প্রিয় মানুষটি আমাকে বাড়িতে রেখে চলে গেল চাকরিস্থল হরিররামপুর। সব ঠিকঠাক করে আমাকে নিয়ে যাবে।

শুরু হলো বিরহ যন্ত্রণা। প্রায় প্রতি সপ্তাহে সে বাড়ি আসতো। তার পায়ের শব্দে আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতো। একটি স্বপ্ন, একটি ভালো লাগা আমাকে বিভোর করে রাখতো সারাক্ষণ। তার বিরহে আমার হৃদয়ে জন্মাতো হাহাকার, শয়নে–স্বপনে, নিশি–দিনে শুধুই সে। তার মধ্যেই খুজে ফিরতাম স্বপ্ন আর সুন্দরকে। তার হৃদয়ের নিবিড় অন্তরঙ্গতায় আমার হৃদয়ে সানন্দ এক অনুভূতি জাগতো। তার চোখে চোখ রেখে হারিয়ে যেতাম এক অজানা ঠিকানায়। সে বাড়ি এলে সারা দিন কাছে পেতাম না। সবার চোখ বাচিয়ে দুই এক পলকের জন্য দুজন দুজনকে দেখে নিতাম শুধু।

রাতে সে আমাকে আদরে আদরে ভরিয়ে দিতো। জড়িয়ে ধরে নাকে নাক ঘষে বলতো, এই দস্যি মেয়ে! তুমি আমাকে কি জাদু করেছো বলো দেখি? তোমাকে ছাড়া আমি আর থাকতে পারছি না। তোমাকে ছাড়া আমি বাচবো না।

যাওয়ার সময় বলে গেল, কোয়ার্টার পেয়েছে, আগামী সপ্তাহে এসে নিয়ে যাবে।

এদিকে আমার একমাত্র ননদের মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ আমাদের দুজনের ছিল দারুণ সখ্যতা। দুজনে মিলে এমন সব দুষ্টুমি করতাম, আর শাশুড়ির বকুনি খেতাম। শাশুড়ির বকুনিও যে এতো মধুময় তা আমার মতো বোধহয় কেউ জানবে না।

অবস্থান হলো বিরহের। স্বপ্ন আর রঙিন দিনগুলো এক এক করে পার হতে লাগলো। একে একে পচিশটি বসন্ত এক সঙ্গে কাটালাম। ছিলাম প্রেয়সী, হলাম জননী। সে আমায় উপহার দিল কোল জুড়ে তিনটি সন্তান। উপচে পড়া সুখ কি আমাকে অহংকারী করে তুলেছিল? বিধি কি সেদিন আড়ালে বসে মুচকি হেসেছিল?

সেদিন কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই এক সাইক্লোনে হারিয়ে ফেললাম আমার ভালোবাসার মানুষটিকে।

আর কখনো তাকে ফিরে পাবো না।

বাহ্যিক চোখে দেখতে না পাই তাকে সে যে আছে আমার হৃদয়ের মধ্যমণিতে। যেখানে সে ছিল, আছে এবং থাকবে। আর কেউ কখনো সে জায়গার দখল নিতে পারবে না।

কারণ আমি যে বঙ্গললনা। তারা যে দ্বিতীয় কাউকে মন, শরীর কিছুই দিতে পারে না।

তবে বঙ্গপুরুষরা অধিকাংশই স্ত্রীর বর্তমানেই এসব সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারে।

মাঝে মধ্যে মনে হয় বড় একা আমি। একাকী জীবন বড় দুঃসহ। আমৃত্যু এ দুঃসহ জীবনটা আমাকে বইতে হবে। এ কথা ভাবলে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ি।

আবার মনে হয়, একা তো নই আমি। আমার সন্তানরা আছে, সহকর্মীরা আছে। আছে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। আছে আমার দেশ, দেশের মানুষ, সর্বোপরি আছে আমার স্রষ্টা। সবাইকে ভালোবাসি আমি। এ ভালোবাসা দিবসে সবাইকে জানাই আমার ভালোবাসা।

গুলশান, ঢাকা

ক্যামেরা ফোন

- সাফকাত সাঈদ

প্রেমে পড়া (Fall in love) কথাটার মধ্যেই কেমন যেন একটা একসিডেন্টাল কিছু বা আকস্মিক কিছুর গন্ধ পাওয়া যায়। প্ল্যান করে এক্সপেরিমেন্ট করে যে প্রেমে পড়া যায় না সে ব্যাপারে আমার নিজের প্র্যাকটিকাল অভিজ্ঞতা আছে।

বাস্তবের কিছু ঘটনা যে কল্পনাকেও হার মানাতে পারে সে কথা অনেক গল্প উপন্যাসে পড়লেও বিশ্বাস করতাম না। ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার আগে শুনেছিলাম প্রেমে পড়াটা নাকি ওখানে মোটামুটি বাধ্যতামূলক। এতো বছর ইউনিভার্সিটিতে পড়ে প্রেমের টিকিটির দেখাও পাওয়া গেল না। কাজ করার পাশাপাশি আরো সার্টিফিকেটের সন্ধানে অন্য একটা পার্টটাইম কোর্সে ভর্তি হলাম। ওহ! আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো,

মোবাইল ফোনের মডেল (অবশ্যই Nokia) বদলানোর ব্যাপারে আমার এক ধরনের ফ্যাসিনেশন আছে। আসলে কম্পিউটার, সেলফোন, গল্পের বই এসবই আমার সময় কাটানোর জন্য আসল বন্ধু। রক্ত–মাংসের প্রাণীর ওপর আমার বিশেষ একটা আস্থা নেই।

নতুন কোর্সের প্রথম ক্লাস। Nokia 3310, 6210, 3100, 7250, 6220, 7650 ব্যবহারের পর এবার Nokia-এর প্রথম মেগা পিক্সেল (1152×864 with 4x Zoom) ক্যামেরা ফোন Nokia 7610 কিনেছি। তাই সামনে যা পাচ্ছি সব কিছুরই ছবি তুলতে ইচ্ছা করছে, যদিও এর আগে তিনটি ক্যামেরা ফোন ব্যবহার করেছি। এর ইমেজ কোয়ালিটি অন্য রকম।

ক্লাসরুমের মধ্যে গিয়ে এমন জায়গায় বসলাম যাতে সবার চেহারাই ঠিকমতো দেখা যায়। একজন করে নতুন স্টুডেন্ট ক্লাসে ঢুকছে। কিন্তু কারো চেহারাই ছবি তোলার যোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। একেবারেই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছি এমন সময় যেন বিধাতা আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যই একজনকে পাঠিয়ে দিল।

একেই বলে বোধহয় Love at first sight। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এশিয়ান অরিজিন। ইনডিয়ান, পাকিস্তানি, না বাংলাদেশি তা অবশ্য পরের কথা। পরনে জিন্স, ফুল স্লিভ শার্ট, খুবই মার্জিত পোশাক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নাম জানা গেল। বালজিত শিনজি, ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিখ। যাক, যতোক্ষণ এই হুর ক্লাসে আছে ততক্ষণ ক্লাসগুলোকে আর বোরিং মনে হবে না।

এবার ছবি তোলার পালা। অ্যমেচার পাপারাজ্জি হিসেবে বন্ধু মহলে আমার আগে থেকেই *কুখ্যাতি* আছে। আসলে বলেকয়ে ছবি তোলার মাঝে কোনো মজা পাই না।

সিট বদলালাম। প্রথম সুযোগকেই কাজে লাগালাম। চারটি স্টিল ছবি আর এক মিনিটের ভিডিও (নকিয়া 7610 টানা দশ মিনিট ভিডিও সাপোর্ট করে) ম্যানেজ করা গেল। ফোনের ওয়ালপেপার বদলিয়ে বালজিত–এর ছবি রেখে দিলাম। একটা বিশ মিনিটের ব্রেক পাওয়া গেল। মনে হলো ওকে একটা সারপ্রাইজ দেয়া যাক। পরিচয় পর্ব আগেই হয়ে গেছে। সবার হাতেই সেলফোন, নাম্বার দেয়া–নেয়া চলছে।

ওর হাতে আমার ফোন দিয়ে বললাম ওর নাম্বার দেয়ার জন্য। কি লক অফ করতেই ওর ছবি ফুটে উঠলো মোবাইল স্ক্রনে। ও একবার ফোনের দিকে তাকিয়েই আমার দিকে সরাসরি তাকালো। বুঝলাম একেবারে রং নাম্বারে রিং করে ফেলেছি।

শুনেছিলাম শিখরা নাকি কোমরে ছুরি রাখে। মনে হলো, হয়তো বা কিছুক্ষণের মধ্যেই ইহধাম ছাড়তে হবে। শেষ প্রার্থনা করে নিলাম। ফোনটা টেবিলের ওপর ছুড়ে দিয়ে ওর সিটে গিয়ে বসলো। ফর্শা মুখের রঙটা বাংলাদেশের রঙ দেয়া চেরি ফলের মতো হয়ে আছে।

এতোক্ষণে খেয়াল করলাম ক্লাসে পিনপতন নিস্তব্ধতা। সবাই আমাদের দুজনকে দেখছে।

ফোনটা টেবিলের ওপর ফেলার পর পরই একটা ইংলিশ (হোয়াইট) ছেলে ফোনটা তুলে নিয়ে ওয়ালপেপার দেখেই আমার দিকে তাকিয়ে বললো, *ইউ শুডন'ট হ্যাভ ডান দিস*।

বুঝলাম আমার পাপারাজ্জি হবার শখ এখানেই শেষ। ফোনটা নিয়ে চুপচাপ গিয়ে সিটে বসলাম। But I never give up.

ক্লাস শেষে বাসায় গিয়ে প্রথমেই Bluetooth দিয়ে ছবি আর ভিডিও কম্পিউটারে ঢোকালাম। তারপর সব ফ্রেন্ডদের কাছে এটাচমেন্ট হিসেবে ওর ছবি পাঠিয়ে দিলাম।

সবাই একবাক্যে স্বীকার করলো, চোখ বন্ধ করে এ+ দেয়া যায় (অবশ্যই চোখ বন্ধ করার আগে একবার ছবিটা দেখে নিতে হবে)।

কিন্তু তা দিয়ে তো আমার কোনো লাভ হবে না যদি ব্যাপারটা লাইনে না আনা যায়। Apology শব্দটা শেখার পর থেকে এই কথাটি যে কতোবার মেয়েদের কাছে টেক্সট মেসেজে, ফোনে এবং ই–মেইলে ব্যবহার

করতে হয়েছে তা গুণে শেষ করা যাবে না। এই প্রথম মনে হচ্ছে, সরাসরি কথা বলার সময় ব্যবহার করতে হবে।

দুই দিন পর নেক্সট ক্লাস। আমার নতুন কেনা BMW (অবশ্যই সেকেন্ড হ্যান্ড মাত্র এক হাজার একশ পাউন্ডে কেনা) কারটা ক্যাম্পাসে পার্ক করে দুরুদুরু মনে ক্লাসে গিয়ে ঢুকলাম। একি! ক্লাসের একমাত্র প্রাণী হচ্ছে বালজিত। আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললো, I'm really sorry, I really over-reacted the other day. I shouldn't have done that.

আমি তো হতবাক! কোথায় আমি ক্ষমা চাইবো বলে প্ল্যান করে এসেছি আর উল্টো কি না ওই আমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে!

এই হচ্ছে বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে এদের তফাত। কতো সহজভাবে জিনিসটা মেনে নিল।

তবুও আমি ক্ষমা চাইলাম। বললাম, ওকে জানিয়ে ছবি তোলা উচিত ছিল।

Apology accepted, আর একটা ভুবন ভুলানো হাসি দিয়ে বললো ছবিটা ওর মোবাইলে পাঠিয়ে দিতে।

পাঠিয়ে দেয়ার পর আমার কাছ থেকে আমার ফোনটা নিয়ে ওর ছবিগুলো ডিলিট করে দিয়ে বললো, আমি যাতে ছবিগুলো আর কোনো জায়গায় ব্যবহার না করি সে জন্যই সে ডিলিট করেছে।

আমিও চেপে গেলাম যে, ওর ছবি ইতিমধ্যে অন্য দুইটি মহাদেশের (এশিয়া, উত্তর আমেরিকা) কমপক্ষে দশটি কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে সেভ করা হয়ে গেছে, কে জানে হয়তো বা কোনো ডেস্কটপের ওয়ালপেপারেরও শোভা বর্ধন করছে।

আরো বিশ মিনিট গল্প করা গেল, ক্লাসে আগে যাবার এই সুবিধা। ওরা দুই বোন। ছোটটা অতোটা সুন্দরী না। ওর সেলফোনেও আমার মতো পরিবারের সবার ছবি, এক ধরনের ফ্যামিলি অ্যালবাম বলা যায়। ওর জন্ম, বেড়ে ওঠা ইংল্যান্ডেই।

ধীরে ধীরে ওর সঙ্গে মোটামুটি একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। আমাদের কোর্সে কম্পিউটার সম্পর্কিত বেশ কিছু টপিক থাকায় আর ওর কম্পিউটার জ্ঞান কিছুটা কম হওয়ায় আমার জন্য একটা সুযোগ এসে গেল। ওকে সাহায্য করার। কাজেই পাঠকরা বুঝতেই পারছেন, এ ধরনের সুযোগ হাতছাড়া করার মতো গাধা আমি নই। ক্লাসগুলোকে আর ক্লাস বলে মনে হচ্ছিল না, স্বপ্নের মতো কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো।

বালজিতদের বাসা কলেজের কাছেই। হঠাৎ একদিন আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ দিয়ে বসলো। আমি কিছুটা অবাক হলেও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলাম না। কারণ ওই দিন রাতে আমার পার্টটাইম জব ছিল। কিন্তু এমনভাবে ধরলো যে, রাজি হতেই হলো। মনে হলো গোল্লায় যাক কাজ। একটা গেলে আরেকটা পাওয়া যাবে। আরেকটা বালজিত এই জীবনে পাওয়া যাবে না।

ক্লাস শেষে আমার গাড়ি চালিয়ে পৌছালাম ওদের বাসা। Semi-detached including off-road parking type-এর বাসা ইংল্যান্ডের প্রায় সব বাসা বাংলাদেশে যেগুলোকে ডুপ্লেক্স বলে সে টাইপের। বাসায় ঢুকেই আরেকটা ধাক্কা খেলাম। বালজিতের মা ইটালিয়ান। এতোক্ষণে বোঝা গেল ওর এতো উজ্জ্বল গায়ের রঙ–এর রহস্য। আমার জন্য আরো কিছু অপেক্ষা করছিল। বালজিতের ছোট বোনের বয়ফ্রেন্ডও বাংলাদেশি, সিলেটি। তারও নিমন্ত্রণ ছিল।

এতোক্ষণে সৃষ্টিকর্তার প্ল্যান বোঝার চেষ্টা করলাম। কারণ সত্যিই বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীতে সব কিছুই কোনো একটা কারণে ঘটে, God has a plan for everyone. এখন আমাকে নিয়ে তার প্ল্যানটা যে কি সেটাই অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম। তবে আমার মাথায় processorটা আর ঠিকমতো কাজ করছিল না। একদিনের জন্য সারপ্রাইজের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল।

ডিনার শেষ হলো। ওর মাকে আমার সত্যি ভালো লাগলো। ব্যবহার বাঙালি মায়েদের (শরৎচন্দ্রের হেমাঙ্গিণীর মতো) মতোই মাতৃসুলভ।

এবার বিদায় নেয়ার পালা। যাবার কথা বলতে যাবো এমন সময় বালজিত বললো, ওর রুমটা দেখে যাবার জন্য।

দোতলায় উঠলাম দুজনে।

ও আমাকে বললো দরজা খুলে লাইট জ্বালানোর জন্য, ও একটু নিচ তলা থেকে আসছে। দরজা খুলে লাইট জ্বালানো মাত্রই জীবনের সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ পেলাম। কোথেকে যেন বেজে উঠলো Corrs-এর *What can I do to make you love me* গানটি এবং চোখে পড়লো রুমের একপাশের অর্ধেক দেয়াল জুড়ে বালজিতের প্রথম যে ছবিটি তুলেছিলাম আমার সেলফোন দিয়ে সেটি একটু এডিট করা। বালজিতের মাথায় বিয়ের ওড়না। তার পাশে আমার সমান সাইজের একটা ছবি। জানি না কখন সে আমার এই ছবিটা তুলেছিল। তবে একটু এডিট করা। আমার মাথায় একটা বিয়ের টোপর বসানো।

হঠাৎ দরজায় শব্দ হতেই পেছনে তাকিয়ে দেখি বালজিত মিটমিট করে হাসছে। তারপর গম্ভীর হয়ে বললো (ইংরেজিতে), *পাপারাজ্জি হিসেবে আমার ফিউচার কেমন?*

ঠিকানা বিহীন
shafkath@yahoo.com

অন্য রকম

- তাবাসসুম

ভালোবাসা এমন একটি নাম। কথা আর সুরে বাধা যেন দুটি প্রাণ। এই দুটি প্রাণ থেকে লক্ষ কোটি প্রাণের সৃষ্টি। আমাদের দুটি প্রাণের অনেক আশা–আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার নতুন মুখটি হলো আমার মামণি। তাকে ঘিরে আমাদের অনেক স্বপ্ন। দুই পরিবারের এ একটি মাত্র মামণি সকলের প্রাণ ঢালা আদর আর ভালোবাসা তার জন্য।

গান, ছড়া বলা, ছুটোছুটি ও ছবি আকতে সে পারদর্শী। এক সেকেন্ড চুপচাপ থাকে না। সারাক্ষণ তার ব্যস্ত সময় কাটে।

হঠাৎ একদিন একটি চিঠি এলো তার চেকআপ দরকার। এখানে মাঝে মধ্যে রুটিন চেকআপ হয়। সাধারণ ব্যাপার। তারপরও কোথা থেকে যেন শঙ্কা এসে গেল।

হাসপাতালে গেলাম।

ডাক্তার অত্যন্ত ভালো মানুষ। কুশল বিনিময়ের পর পরীক্ষা করে বললেন, গুড।

আমার মামণি বলে, আমি ভালো আছি, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমি এখন খেলতে যাই বলে এক ছুটে প্লে কর্নারে চলে গেল।

ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো সমস্যা, কেমন দেখলেন?

তার উত্তরে ডাক্তার আমাদের জিজ্ঞাসা করলো আমরা কেমন আছি। কোন দেশ থেকে এসেছি। কতোদিন হলো এখানে আছি। প্রফেসরের নাম কি। জাপান কেমন লাগে। কোন খাবার পছন্দ, সাকুরা কেমন লাগে। কবে নাগাদ দেশে যাবো ইত্যাদি। শেষে বললেন, কিছু টেস্ট করতে হবে তারপর বলা যাবে কি হয়েছে। পরের সপ্তাহে যেতে হবে।

ভীষণ টেনশন নিয়ে আমরা বাসায় এলাম। কিছুই ভালো লাগছে না। কোনো কাজ ঠিক মতো করতে পারছি না। সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বার বার শুধু জিজ্ঞাসা করি, মামণি, তোমার খারাপ লাগে? কোনো অসুবিধা হচ্ছে, তুমি ঠিক আছো তো?

সে বলে, আমার কিছু হয়নি, আমি ভালো আছি। তুমি আমার জন্য চিন্তা করো না।

পরের সপ্তাহে ডাক্তার যা বললো তার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তার ছোট একটা অপারেশন করতে হবে। এখানে সম্ভব নয়। অন্য শহরে যেতে হবে।

বিখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ সানোসোন্স তাকে দেখে বললো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করা ভালো।
নির্দিষ্ট দিনে সানোসোন্স ও কাওয়াদা সেন্সে তার অপারেশন করলেন। পুরো পাচ ঘণ্টা সময় লাগলো। সে যে কি টেনশন, ভয়, আশঙ্কা তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারবে না। পাশের বেডের ইকাচান এসেছে ওসাকা থেকে। তার এক বছর বয়সে একবার অপারেশন হয়েছে। তিন বছর বয়সে একবার হয়েছে। এখন আরেকবার করতে হবে।
এমন অনেক শিশু আছে এখানে যাদের একাধিকবার অপারেশন হয়েছে বা করতে হবে। অনেক কঠিন অসুখ। এসব দেখে নিজেকে সান্ত্বনা দিই। এতো অল্পতে কেন এতো অস্থির হচ্ছি। আমার মামণি ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে।
সারাক্ষণ দুজন তার সঙ্গে আছি। রাত্রে একজন থাকতে পারে। একজনকে হোটেলে গিয়ে থাকতে হয়।
এ সময় বাংলাদেশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বাবা-মা ফোন করে সান্ত্বনা দেন, ধৈর্য ধারণ করতে বলেন।
আব্বা বলেন, মসজিদে প্রতিদিন তোমার মেয়ের জন্য দোয়া পড়ানো হয়।
আম্মা বলেন, পাচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে কোরআন শরিফ পড়ে আমার বুবুর জন্য দোয়া করি। আল্লাহর রহমতে সে ভালো হয়ে যাবে।
এখানে ডাক্তার নার্স সবাই খুব ভালো।
অল্প দিনের মধ্যে আশপাশের সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। সবাই সহানুভূতিশীল মনে হয়। সকলেই আপনজন, অতি পরিচিত। সকলের দোয়া ও আল্লাহর রহমতে আমার মামণি তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।
ব্যস্ততার মাঝেও দাদা এসে আমাদের বাড়ি নিয়ে যান। এতো মানুষের এই অন্য রকম ভালোবাসার কথা কোনোদিন ভোলার নয়।

জাপান থেকে

দেবীর বোধন

- ভালোবাসার পতন

জীবনের শুরু থেকে একটা স্বপ্ন ছিল মনের মতো একজনকে বিয়ে করবো এবং সুন্দর সাজানো-গোছানো সংসার করবো। এমন একটি স্বপ্ন নিয়ে ১৯৯৭ সালের ভালোবাসা দিবসের দুই দিন আগে একজনকে বিয়ে করলাম। যদিও তার সঙ্গে বিয়েতে আমিসহ আমার সব আত্মীয়স্বজনের অমত ছিল। পরে অবশ্য বিধাতার ইচ্ছায় সবার মতেই বিয়ে হয়। মনে প্রচণ্ড আবেগ ও বিশ্বাস নিয়ে আমার ভালোবাসা স্ত্রীকে উজাড় করে দিলাম। সে আমাকে কেমন ভালোবাসতো তা নিয়ে কখনো ভাবিনি।
এভাবে কেটে গেল কয়েক বছর। বাইরে সবাই আমাদের দেখে হিংসা করতো শুধু আমাদের দুজনার ভালোবাসা ও চলাফেরা দেখে। এরপর ঘর আলো করে এলো এক ফুটফুটে সন্তান। তবে এতো ভালোবাসার মাঝেও দুই এক সময় সামান্য কথাকাটাকাটি হতো এবং তা আবার অল্প সময়ের মধ্যে মিটে যেতো।
একবার বাসা থেকে সে (স্ত্রী) বাপের বাড়ি যায় তার বাবার সঙ্গে। যাওয়ার কিছু দিন পর হঠাৎ করে সে তার আত্মীয়স্বজনকে জানিয়ে দেয় *আমার সঙ্গে তার থাকা সম্ভব নয়।* তবে আমার বিশ্বাস, ওই কথা বলার মতো বড় কোনো ঘটনা তার (স্ত্রী) সঙ্গে ঘটেনি।
তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসার কারণে তার কথামতো তার মা-বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে আনলাম। পরে শুনলাম তার এক নিকট আত্মীয় এবং দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় যার সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ের চেষ্টা চলছিল, এই দুজনার প্ররোচনায় আমার স্ত্রী ওই না থাকার নাটক করেছিল।

এরপর যা দেখলাম ও শুনলাম তাতে আমার ভালোবাসা এবং বিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। এবার বুঝলাম আমার সঙ্গে তার না থাকার কথা বলার কারণ। তার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি পাঠকদের জন্য।

এক. একবার আমার স্ত্রী তার বাবার বাড়িতে বেড়াতে গেল। আমার শাশুড়ি তাকে বাসায় রেখে অন্যত্র বেড়াতে গেল। বাড়িতে শুধু আমার স্ত্রী ও সন্তান। তখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার সেই দূরসম্পর্কের আত্মীয় (ছেলে) আমার স্ত্রীর বাসায় (বাপের বাসায়) আসতো এবং গভীর রাত পর্যন্ত থেকে খাওয়া–দাওয়া করে চলে যেত। এভাবে আমার শাশুড়ি যতোদিন অন্যত্র ছিল তখন প্রতিদিনই এভাবে চলতো। এটা নিয়ে পাড়া–প্রতিবেশীদের বেশ গুঞ্জন শুরু হলেও তাদের অভিসার থেমে থাকেনি।

দুই. বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে দোকান, কম্পিউটার সেন্টার, উভয়ের বাড়িতে স্ত্রী ও তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় দেখা সাক্ষাৎ করে এবং তাদের গল্পগুজব চলে লাগামহীন গতিতে। সেই আত্মীয়ের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে চলে সমানে আড্ডা ও খোশগল্প।

তিন. আমি বাইরে থাকাকালে আমার স্ত্রী ফোন সেন্টারে গিয়ে আমাকে না জানিয়ে তার সেই আত্মীয়ের মোবাইলে ০১৭২–১২.... (সংখ্যা উলটপালট করতে হবে) ফোন করে এবং দীর্ঘক্ষণ খোশগল্প করে। আমার বাসার টিঅ্যান্ডটি থেকেও তাকে সুযোগ পেলেই ফোন করে। তার বাবার বাড়িতে এই সুযোগ আরো বেশি।

চার. আমার স্ত্রীর সেই আত্মীয় প্রায়ই বাসায় আসে। তখন আমার স্ত্রী সবাইকে বাদ দিয়ে, এমনকি আমাকেও বাদ দিয়ে তাকে নিয়ে অন্য রুমে গিয়ে খোশগল্পে মেতে ওঠে। সে গল্পের শেষ নেই। সেখানে কাউকে যেতে দেয় না। নিজের ছোট ভাইকে পর্যন্ত যেতে দেয় না।

পাচ. আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার সেই আত্মীয়ের সম্পর্ক এমন যে, তাকে একা স্পেশাল না খাওয়ালে আমার স্ত্রীর মন ভালো হয় না। তাই আমার চলে আসার পর সে তার সেই আত্মীয়কে বন্ধুবান্ধবসহ স্পেশাল নিমন্ত্রণ করে মনের মতো রান্না করে খাওয়ায়। তার সেই স্পেশাল নিমন্ত্রণ আমার শ্বশুর–শাশুড়ি কোন দৃষ্টিতে নিয়েছিলেন এটা আজ আমার প্রশ্ন?

ছয়. সেই আত্মীয় তার সব কাজের সিদ্ধান্ত আমার স্ত্রীকে জানিয়ে পরামর্শ নেয়। দুই পরিবার (স্ত্রীর ও আত্মীয়ের) তাদের সকল বিষয়ে আলাপ–আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। আমার চোখের সামনে এ রকম ঘটনা ঘটেছে।

সাত. সেই আত্মীয় স্ত্রীর বাসায় এলে গল্প করে এবং আপ্যায়ন শেষে চলে যাবার সময় গেট খুলে দাড়িয়ে থাকে এবং গেট বন্ধ করে ব্যালকনিতে আত্মীয় চলে যাওয়া পর্যন্ত পথ চেয়ে থাকে।

আট. বিছানায় আমি তার কাছে গেলে সে তেমন আগ্রহী হয় না। বরং বলে *একই জিনিস রোজ ভালো লাগে না।* অথচ অতীতে বিছানায় গেলে কিছু না হলে আমার স্ত্রীর ভালো লাগতো না। কেন এমন হলো? আমার স্ত্রীর কি তাহলে অন্যত্র ভালো লাগে?

নয়. আমার স্ত্রীর সেই আত্মীয় আমি শ্বশুরবাড়ি থাকাকালীন আমার সামনে আসে না বা আমার শ্বশুরবাড়ি আসে না। অবশ্য টেলিফোনে সব সময় যোগাযোগ করে। না আসার কারণ হিসেবে সেই আত্মীয় বলে, আমি নাকি কোনো একদিন তার সঙ্গে এমন ভাব করেছি যেন সে আমার বড় শত্রু। অথচ তার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আমার স্ত্রী ও তার আত্মীয়স্বজনের হীন কার্যকলাপ চলতে থাকলে একদিন অতিষ্ঠ হয়ে স্ত্রীকে বললাম, *দেবী,* তুমি যদি ওর সঙ্গে যেতে চাও তাহলে আমি তোমাকে এখনই ডিভোর্স দেবো।

তখন সে কোনো সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে এবং বলে, বাড়িতে তার মায়ের দেখাশোনা করে বিধায় ওই ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলছে। অর্থাৎ *শ্যামও রাখি, কূলও রাখি।*

এ রকম আরো অনেক অনেক ঘটনা ও কাহিনীর সাক্ষী আমার চোখ এবং কান। অন্য সবার কথা অবিশ্বাস করলেও নিজের চোখ ও কান কি অবিশ্বাস করতে পারি? আজ এই ভালোবাসা দিবসে আমার প্রশ্ন, এতোসব

কাহিনীর পরও কি তার সঙ্গে ঘর করা যায়? তাকে ভালোবাসা যায়? হ্যা, তারপরও আমরা এক ছাদের নিচে আছি। তবে সেটা কি মন থেকে?

এখনো তার কাছে যাই। যখন তার কার্যকলাপ মনে ওঠে তখন নিজের ওপর প্রতিশোধ নেই। কারণ আমি সমাজের এমন এক স্তরে প্রতিষ্ঠিত যেখানে বসে তাকে ডিভোর্স দিতে পারছি না এবং কাউকে বলতেও পারছি না মনের এতো কষ্ট, এতো ব্যথা। তাই মাঝে মধ্যে আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করি। কিন্তু আমার সন্তানের কি হবে? ওরা দুজন তো স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে। তাই অনন্যোপায় হয়ে আজও আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি। তবে সেটা কি মন থেকে? অতীতের মতো, পাগলের মতো?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
porajita4@yahoo.com

হনুমান

- লাভলি

কেউ কাউকে না দেখে, না শুনে, কাগজে-কলমে লিখে চিঠির মাধ্যমে মনের ভাব লেন-দেন করাকে বলা হয় পত্রবন্ধু। এই পত্রবন্ধুর সম্পর্কটা খুবই চমৎকার। সুন্দর, অতি পবিত্রতম এক সম্পর্ক। শুধু লিখে লিখেই একজন একজনকে চেনে, জানে এবং বোঝে। যারা লিখতে পছন্দ করেন বা লেখার অভ্যাস যাদের আছে, সাধারণত তারাই পত্রবন্ধুর সম্পর্কটা করে থাকেন। কেবল বন্ধু নয় – ভাই-বোন, মা-বাবার সম্পর্কটা হয়ে থাকে এ লেখার মাধ্যমে। তবে বেশীর ভাগই বন্ধুত্ব। কোনো পক্ষের যেমন ভালো না লাগলে সীমিত সংখ্যক লেখায়ই পত্রবন্ধুর সম্পর্কের চিড় ধরে ঠিক তেমনি দুপক্ষের ভালো লাগায় আবার এই পত্রবন্ধুর সম্পর্কটাই দীর্ঘস্থায়ী, এমনকি সারা জীবনের সম্পর্কেও রূপ নেয়। ভালোলাগা থেকে ছবির লেন-দেন, ফোনে কথোপকথন, দেখা-সাক্ষাৎ থেকে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়। আবার অন্যায়ও নেই যদি নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কোনো কথা বন্ধুকে না জানিয়ে কোনো প্রকার প্রতারণা না করা হয়।

ভূমিকা তো খানিকটা বড় হয়ে গেল বলে অনেকে হয়ত অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। তবে ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা ছিল আবশ্যকীয়।

ছাত্র জীবন থেকেই আমার লেখালিখির একটা অভ্যাস ছিল। গল্প, কবিতা কিংবা চিঠি লেখা। দেশে থাকাকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় টুকটাক লিখতাম। বিদেশে এসে একাকিত্ব ঘোচাতে আরো বেশি লিখতে চেষ্টা করতাম।

একদা পত্রিকার পাতা থেকে আকর্ষণীয় এক বিজ্ঞাপনের ঠিকানা তুলে নিয়ে লিখে ফেললাম। সে থাকে আরবের পবিত্র মাটিতে আর নামের প্রথম অক্ষর হ এবং শেষের অক্ষর না। না-ইবা বললাম পুরোটা। তার নাম দিলাম *হনুমান*।

আমার চিরকুট টাইপের চিঠিটা পাওয়ামাত্রই কালবিলম্ব না করে হনুমান উত্তর পাঠিয়ে দিল। চমৎকার লেখা। হাতের লেখা আর লেখার ধরন দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় লোকটি শিক্ষিত, জ্ঞানী এবং সুলেখক। আমিও তার প্রতিটি চিঠির উত্তর দিয়ে যেতে থাকলাম। কখনো প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততায় দুই একটা চিঠির জবাব লিখতে ভুলে গেলেও হনুমানের ভুল হতো না। সে অপেক্ষা না করে বিরামহীন লিখে যেতে লাগলো।

এমনি করে চিঠিগুলো লিখতো যে, উত্তর না দিলে নিজেকে বড্ড অপরাধী মনো হতো।

হনুমান প্রায় প্রতিদিনই চিঠি লিখতো। কখনো কখনো তার দুই তিনটি চিঠি এক সঙ্গে পেতাম।

এভাবে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। সে এবার পেনফ্রেন্ডের আসন ছেড়ে প্রেমিক হবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো। তার লেখার জাদুকরী আকর্ষণে কিছুটা দুর্বল যে হয়ে পড়িনি তাও নয়। তবুও ছাত্র জীবনের বিচার-

বুদ্ধি আর কর্মজীবনের বিচার–বুদ্ধি, জ্ঞান তো এক হয় না! বাস্তব জীবন তো চিঠির আবেগে চলে না। তাই এক পা এগিয়ে দুইপা পিছিয়েই থাকতাম।

কেউ কাউকে দেখিনি, শুনিনি, এমনকি ফোনের মাধ্যমেও কেউ কারো গলার কর্কশ কি সুমধুর কণ্ঠের আওয়াজ পর্যন্ত শুনিনি। একজন ভালো মানুষ, একজন সমব্যথী, সমদরদি আমার প্রয়োজন বটে। তাই বলে তো দেখে, শুনে, বুঝেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

হনুমান লিখলো, সে এতোদিন আমার মতো শিক্ষিত, জ্ঞানী, গুণী, সংস্কৃতিমনা, সাহিত্যানুরাগী ইত্যাদি যোগ্যতা সম্পন্ন কাউকে খুজে পায়নি বলেই বিয়ে করে সংসারী না হয়ে আরবের তপ্ত বালুচরে নিজেকে পুড়িয়ে খাটি করেছে আর নিবিষ্ট চিত্তে তার হৃদয় মানসীকে খুজছে!

অবিশ্বাস করি না আবার বিশ্বাস করতে গেলেও যেন হাজার অজানা প্রশ্ন এসে বিবেককে জেরা করে।

দোটানায় পড়ে তার সঙ্গে কলম সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলছিলাম।

কিছু দিনের ভেতর লক্ষ্য করলাম তার চিঠি লেখার ধরণ অন্য রকম। তার সারা চিঠি জুড়ে একটা কথাই গুরুত্ব পাচ্ছে, তা হলো, সে কিভাবে, কতো দ্রুত ইটালিতে ঢুকতে পারে, ভিসা কিভাবে নেয়া সম্ভব, এসে দ্রুত কি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। আমি কোন ধরনের সাহায্য করতে পারবো ইত্যাদি!

কতো ক্যাশ দিতে পারবো!

আমার কেন জানি মনে হতে লাগলো হনুমান আসলে দুর্দান্ত টাইপের একজন লোক। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই সে আমাকে এতো সব মধুর চিঠি লিখছে। আমাকে ব্যবহার করে সে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় ইটালিতে। একজনকে ভালোবাসা এক রকম আর অর্থকে ভালোবেসে তার পেছনে ছোটা অন্য রকম। অর্থের মাপকাঠি দিয়ে কি মানুষের বিবেক–বিবেচনা–হৃদয় বিচার করা যায়? অর্থই যে সকল অনর্থের মূল!

এক সময় কলমের নরম কালি দিয়ে তাকে কিছু শক্ত কথা লিখি। সে যেন আমাকে আর না লেখে বলে দিই। তার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে ভেবে সে আমাকে যা ইচ্ছা তাই লিখলো। ইওরোপ আমেরিকার চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করলো। এক কথায় ফৃ সেক্সের দেশে যারা থাকে সবাই খারাপ। সবার চরিত্র শেষ। পোশাকের মতো এরা সবাই বন্ধুত্বও পাল্টায় ইত্যাদি যতো নোংরা, অশ্লীল ভাষা আছে সুলেখক হনুমান তার সবটাই ব্যবহার করেছে। আরব দেশে যারা থাকে তারা নাকি দুধে ধোয়া তুলসী পাতা।

আমি তার অশ্লীল চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হলাম। তার প্রথম দিকের চিঠিগুলোর নিখাদ ভালো মানুষি মনোভাব, শব্দ চয়ন, ভাষা, ব্যকরণের নির্ভুল প্রয়োগ, সৌন্দর্য সব কিছু যেন ইতিহাস হয়ে গেল আমার কাছে। মাত্র একজন কলম বন্ধুর সম্পর্কের সূত্র ধরে যে এত বড় কিছু আশা করে আবার তাকেই সে এতো অপমান, অসম্মান করে কি করে? আসলে ভদ্রলোককে চোর বললে *দুঃখ পায়* আর চোরকে চোর বললে আতে *ঘা লাগে*। কলম যুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে আগ্রাসী হামলা চালিয়ে অবশেষে বাংলাদেশি রাজনীতির স্টাইলে সে বিভিন্ন হুমকি–ধামকি দিয়েও কোনো ফল পেল না। অবশেষে সে পুনরায় এক চিঠি দিয়ে আমার সহানুভূতি প্রার্থনা করেও কোনো আশাব্যঞ্জক সাড়া পেল না।

দীর্ঘ তিন চার মাস হবে হনুমানের সন্ত্রাসী মনোভাবের কোনো লেখা না পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

হঠাৎ একদিন আমার নামে একটা চিঠি এলো বাংলাদেশ থেকে। খামের উপরে নাম ঠিকানা নেই। অথচ হাতের লেখটা হনুমানের। চার পাচ পৃষ্ঠার চিঠিটা খুলে পড়লাম। লেখাটা হনুমানের নয়। এ টু জেড পড়ে ভাব–লেশহীনভাবে কতোক্ষণ অনড় বসে ছিলাম জানি না।

আমার রুমমেট লাওরা–র ডাকে আমার সংবিৎ ফিরে এলো।

চিঠিটা কয়েকবার পড়লাম। যার অর্থ হলো হনুমান আমাকে একটা চিঠি কখনো কোনো সময়ে লিখেছিল। তা আর পোস্ট করা হয়নি। খামটা তার বৃফকেসে অথবা লাগেজে করে তার সঙ্গে বাংলাদেশে চলে যায়। তার

চার সন্তানের জননী স্ত্রী কোনোভাবে চিঠি পেয়ে যায় এবং খুব শক্ত একটা ফাইট দেয় তার স্বামী হনুমানের সঙ্গে।

মহিলা আমাকে অহেতুক ভুল বুঝে অনেক দুঃখজনক কথা-বার্তা লেখেন। যা পড়ে খুবই কষ্ট পেয়েছি। খুব ইচ্ছা ছিল মহিলাকে একটা যথার্থ চিঠি দেয়ার। কিন্তু ঠিকানার অভাবে তা হলো না।

হনুমানের চিঠি পড়ে ভালো লাগতো। তাই বলে তাকে তা ভালোবাসিনি। কলমবন্ধু হুট করে প্রেমিক হতে পারে না। বিয়ে করা ভালোবাসার প্রশ্ন বহু দূর।

তাছাড়া জেনেশুনে চার সন্তানের জনকের সঙ্গে পেনফ্রেন্ড করারই প্রশ্ন আসে না। সম্পর্ক তো অবান্তর। হনুমানকে তো পেনফ্রেন্ডের অযোগ্য সনদ দিয়ে তো অনেক আগেই লেখালিখি বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

এ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলবো, হনুমান পর্যায়ের যারা আছেন, দয়া করে নিজের স্ত্রী সন্তানদের আড়াল করে অন্য কোনো সহজ সরল মেয়েকে ধোকা বা প্রতারণার চেষ্টা করবেন না। নিজের স্ত্রীকে প্রতারণা করে ভণ্ড লেখক সাজবেন না। আর হনুমানের স্ত্রীদের পরিস্থিতিতে কেউ পড়লে এটুকু বলবো, মাথা ঠান্ডা রাখুন, প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা করুন, সুন্দর ও আন্তরিক ভাষায় চিঠি লিখুন পূর্ণ ঠিকানাসহ। তাতে আমার স্থলে কোনো ভালো, শিক্ষিত মেয়ে হলে অবশ্যই হনুমানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তার স্ত্রীকে সহানুভূতির হাত বাড়াবে।

আর যারা আমার মতো বর্তমানে লেখালিখি করছেন তাদের প্রতি অনুরোধ, ভালোভাবে যাচাই করে তবে পরবর্তী স্টেজে পা দেবেন। হনুমান সন্ত্রাসীদের পাল্লায় পড়ে কেউ যেন প্রতারিত না হোন এ প্রার্থনাই করি সৃষ্টিকর্তার কাছে। আল্লাহকে হাজার শুকরিয়া সে আমাকে বড় কোনো বিপদ থেকে অল্পতে রক্ষা করেছে বলে।

ইটালি থেকে

অর্পিতার খণ্ড চিঠি

- অর্পিতা

এক. দীর্ঘ তিন মাস পর তোমার সঙ্গে আজ দেখা হলো। আজ দিনটা অন্যদিনের চেয়ে একটু আলাদা। আগে যখনই দেখা হতো, একটু না একটু ঝগড়া হতোই। কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া হয়নি। ঝগড়া বলতে তোমার কথা শুনে আমি চুপ মেরে যাই আর আমার কথা শুনে তুমি। পরে অবশ্য দুজনেই ঠিক হয়ে যাই।

তবে আজ আমার রাগ করার কথা ছিল। কিন্তু রাগ করিনি। আসলে তোমার ওপর রাগ করে থাকতে পারি না। তোমার সামনে গেলে কেমন যেন চুপ হয়ে যাই। এভাবে চুপ করে বসে থাকার কারণে তুমি আমাকে একদিন *শোপিস* বলেছিলে।

বাসা থেকে ঠিক করি তোমাকে অনেক কথা বলবো। কিন্তু কিছুই বলতে পারি না। তোমার কথা শুনতেই আমার ভালো লাগে। তাই তো ফোন করে চুপ করে তোমার কথা শুনি। যখন তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে তখন আমি এমন করি। তুমি তো তা বুঝতে পাও না।

যদি বুঝতে তাহলে জিজ্ঞাসা করতে না, তোমার কি ফিলিংস শেষ হয়ে গেছে?

তোমার এই কথায় আমি যে কতোটা কষ্ট পেয়েছি তা কি তুমি জানো অনিক?

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

দুই. আজ ৫ আগস্ট। সকাল এগারোটায় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো বৌদ্ধ মন্দিরে। তারপর গেলাম তোমার বাসায়। অনেক দিন পর তোমাকে কাছে পেলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিই। কিন্তু কেন জানি পারছিলাম না। আর তুমি আমাকে কাছে পেলে যে কি করো না! তোমার তেমন কোনো পরিবর্তন

হয়নি। শুধু একটু মুটিয়ে গেছো। খারাপ লাগছে না। তবে আরো মোটা হলে খারাপ লাগবে। অনিক, তুমি কি জানো, তোমার বাসায় একটা জিনিস আমার খুব ভালো লেগেছে। সেটা হচ্ছে তোমার বাবার ছবি। তোমার বাবা খুব সুন্দর। তুমি বাবার মতো হলে না কেন?

৫ আগস্ট ২০০৩

তিন. আজ ২২ সেপ্টেম্বর তোমার জন্মদিন। জানি না তুমি কেমন আছো। মন-প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করছি তুমি ভালো থেকো। বিকেলে ফোনে অনেক চেষ্টা করেছি। তোমাকে পাইনি। তাই মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। তুমি যদি একবার বাসায় আসতে কি যে ভালো হতো! এলে না কেন? তুমি কি আমাকে ভুলে গেছো? গত পাচটি বছরের একটি মুহূর্ত তোমায় ভুলিনি। তুমি কি করে ভুলতে পারলে? সরি, এসব কথা বলা আজ উচিত হচ্ছে না। আজ যে তোমার জন্মদিন। শুভ জন্মদিন অনিক। তোমাকে অনেক অনেক-অনেক-অনেক-অনেক ভালোবাসা। বেচে থাকো হাজার বছর।

২২ সেপ্টেম্বর ২০০৩

চার. আজ ২২ ডিসেম্বর। সকাল এগারোটা। তোমার কাছে ফোন করলাম। তুমি জিজ্ঞাসা করলে, আজ আসতে পারবে? বললে, প্লিজ চলে এসো।

বললাম, সাড়ে এগারোটায় আমি বের হচ্ছি। তোমার বাসায় আসবো।

মিথ্যা বলেছি। কেন বলেছি জানি না। তবে তোমাকে রাগাতে আমর খুব ভালো লাগে।

আজ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর যদি তোমাকে ফোন করি তবে তুমি বলবে এমনটা না করলে কি হতো না? তোমাকে আর কখনো আমি আসতে বলবো না।

রাগের সাথে একটু টেনশনও হবে আমার জন্য। রাস্তায় কোনো বিপদ হলো কি না। কি, ঠিক বলিনি অনিক? আজ তবে এখানেই বিদায়। দেখা হবে কথা হবে, অন্য কোনোদিন, অন্য কোনো সময়।

২২ ডিসেম্বর ২০০৪

চট্টগ্রাম থেকে

শত্রুমিত্র

- আলি হোসেন চৌধুরী

পৃথিবী নামের এই ভূখন্ডে ভালোবাসার দেশ হিসেবে শীর্ষে রাখছি বাংলাদেশকে। না, এটা আবেগের কথা নয়। পাঠক, লেখাটা পড়লে আপনিও সেই রায় দেবেন।

হ্যা, বাংলাদেশই পৃথিবীর সেরা রিয়াল ভালোবাসার দেশ।

দ্বীপপুঞ্জ ঘেরা ফিলিপিনস রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। ভালোবাসার তৃতীয় দেশটির নাম ইন্দোনেশিয়া আর চতুর্থ স্থানে রয়েছে সউদি আরব। ভালোবাসার সংবেদনশীল কোষগুলো তৈরি হয় চারপাশের ভালো লাগার বিষয় থেকে। তারপর হৃদয়ে জন্ম নেয় অনুভূতি। এবং তা গিয়ে স্থির হয় কোনো নারীর ওপর। সৃষ্টি হয় আবেগ এবং শুরু হয় ভালোবাসা বিষয়ক অনিশ্চিত পথযাত্রা।

লক্ষ্য করুন, আপনার চারপাশে ভালো লাগার মতো একটি বিষয়বস্তু নেই। শব্দ দূষণ, অপচ্ছিন্নতা, রাজনৈতিক সহিংসতা, বোমা, গুলি, গ্রেনেড, হরতাল, খুন-জখম, প্রাকৃতিক বিপর্যয় যথা ঝড়-অতিবৃষ্টি-বন্যা, রোগ-ব্যাধি, বেকারত্ব, সীমাহীন দুর্দশা, সর্বোপরি জীবনের অনিশ্চয়তা, ভালো না লাগার মতো সবই রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, এই ভয়ংকর অসুন্দরের ভেতর বাংলাদেশের মানুষ যুগ যুগ, শতাব্দীকাল ধরে বেচে আছে চমৎকার সহানুভূতিহীন ভালোবাসা নিয়ে। এমনটি পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। ক্ষিধে, অভাব আর দারিদ্রতার মাঝে ভালোবাসার এক চিলতে হাসি বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও কি আছে? না, নেই।

বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে ভালোবাসাকে লালন ও সংরক্ষণ করে আবেগ, অনুভূতি আন্তরিকতা, সততা ও বিশ্বাস দিয়ে – অর্থবিত্ত দিয়ে নয়।

দুই. ফিলিপিনস।

বিশ্ব বাজারে ফিলিপিনো মেয়েদের ডিমান্ড সবচেয়ে বেশি, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। কারণ – *এক.* এরা দৈহিক গঠনে ছোট এবং সুন্দরী। *দুই.* এদের হৃদয় ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। *তিন.* সেক্সে অত্যন্ত পারদর্শী। ইওরোপ, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার নাবিক, সৈনিক, ব্যবসায়ী বা দুষ্ট প্রতারণাকারী এইডস–এ আক্রান্ত লোকেরা ফিলিপিনস এসে নিজেদের পছন্দ মতো বিয়ে করে কেউ নিয়ে যায় নিজ দেশে, কেউবা মজা লুটে ফেলে চলে যায়। বাংলাদেশের তরুণেরা এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। সিংগাপুরে কর্মরত শতকরা আশি ভাগ ফিলিপিনো নারীর প্রেমিক বাংলাদেশি। একজন ফিলিপিনো মেয়ে অল্প সময়ে জয় করতে পারে যে কোনো পুরুষের হৃদয়।

তিন. ইন্দোনেশিয়া

এরা সাধারণত সহজ–সরল এবং নির্যাতিতা। খুব সহজে এদেরকে হাত করে ফেলে চতুর লোকেরা। ভালোবাসার কথা বললে এরা মোমের মতো গলে যায়। ভালোবাসার অভিনয় করে খুব সহজেই চলে যায় সেক্সের জগতে। সুলভ মূল্যে বেচাকেনা হয় এদের ভালোবাসা। এই মেয়েদের প্রথম পছন্দ থাইল্যান্ড, দ্বিতীয় ইনডিয়া এবং তৃতীয় বাংলাদেশের মানুষ। তবে ইওরোপ আমেরিকানদের কেউ এক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। ফিলিপিনো মেয়েদের মতো এরা ইংরেজিতে পারদর্শী নয়।

থাইল্যান্ডের পুরুষেরা গড়পড়তায় এশিয়ার সবচেয়ে সেক্সি পুরুষ। এরা দীর্ঘক্ষণ সেক্সে পারদর্শী। এক জাতীয় উদ্ভিদের মূল রোদ্রে শুকিয়ে চিবিয়ে খায়। এটা ভায়াগ্রাকে হার মানায় এবং কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। দাম্পত্য জীবনের সুখের জন্য বাংলাদেশের পুরুষেরা খেয়ে দেখতে পারেন। সবুজ পাতার (৮ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি) সমূল থেকে কাণ্ড মিলে এক ফুট উচ্চতা। মাটির নিচের অংশটা রসুনের মতো। এর বৈজ্ঞানিক নামটা জানা নেই। তবে থাইম্যানরা বলে, *সাইদাম* যা ব্যাংকক–এর সর্বত্র বিক্রি হয়। কেজি পঞ্চাশ ইউএস ডলার। মিরপুর ও বলদা গার্ডেনে এই উদ্ভিদিটি দেখেছি যার গুণাগুণ সম্পর্কে আদৌ কেউ জানে না।

চার. সউদি আরব

ওখানে ভালোবাসা ওয়ান সাইডেড অর্থাৎ শুধু মেয়েরাই এ বিষয়ে আগ্রহী। সউদি আরবের পুরুষরা নির্মম, নিষ্ঠুর, পাপী অথচ ধার্মিক। কিন্তু মেয়েরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারো স্ত্রী চারজন। একজন হয়তো নিয়মিত সেক্স পাচ্ছে স্বামীর কাছ থেকে, বাকিরা বঞ্চিতা। কিশোরী ও তরুণীরা প্রকাশ্যে তাদের ভালো লাগা ও ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ পায় না। এইসব নারীরা ভালোবাসা পেতে, দিতে এবং নিতে খুবই আগ্রহী। দেশি ও বিদেশি কোনো পুরুষ ভালোবাসার চির কাঙাল এই অসহায়াদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না। কারণ ধরা পড়লে নির্ঘাৎ মৃত্যুদণ্ড। হাজার বছর ধরে মরুর বুকে ভালোবাসার অনুভূতিগুলো এভাবেই ছুরি, কাচি আর পাথর নিক্ষেপের কাছে বলিদান হচ্ছে।

এবার জেনে নিন ভালোবাসার বাধাগুলো।

এক. ধর্ম

পৃথিবীতে কিছু ধর্মের বিয়ের আগে প্রেম বা ভালোবাসাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ধর্মের অনুশাসন মেনে চললে একজন পুরুষ ও নারীকে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় বা বয়সে ভালোবাসাহীন থাকতে হবে। ভালোবাসা সেখানে কঠোর–কঠিন শৃংখলে আবদ্ধ। আশার বিষয়, এ প্রজন্মের তরুণ–তরুণীরা সীমাবদ্ধতা ভাঙছে ধীরে এবং ধীরে। এগিয়ে যাচ্ছে ভালোবাসার হাতছানিতে গোটা বিশ্বময়।

দুই. অর্থবিত্ত

অর্থই সকল অনর্থের মূল এটা প্রবাদ বাক্য। ভালোবাসার রাজ্যে অর্থ ছাড়া জীবন অর্থহীন এটা যেমন সত্য তেমনি একজন তরুণ ও তরুণীর বা পরকিয়া প্রেম যখন গড়ে ওঠে তখন অর্থটা থাকে অর্থহীন। ভালোবাসা যখন পূর্ণতা লাভের পথে এগোয় তখন অর্থটা নীতি নির্ধারক হয়ে যায়। একজন প্রেমিকের কাছে অর্থ ও বিত্ত নেই, আছে অফুরন্ত ভালোবাসা। কিন্তু অন্য একজনের কাছে ভালোবাসার অনুভূতি নেই, রয়েছে অর্থ। সেই অর্থ ও বিত্তের যোগ্যতায় প্রেমিকের হাত থেকে বৈধভাবে ছিনিয়ে নেয় প্রেমিকাকে। পরিবার ও সমাজ তাতে সায় দেয়। নারী নিগ্রহের এই গ্রহে, নারীরা এক সময় মেনে নেয় ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও। এভাবেই দেশের প্রাথমিক ভালোবাসাগুলো আহত–নিহত হয় অর্থ ও বিত্তের কাছে।

তিন. আইন ও পুলিশ

আইনগত ভালোবাসার স্বীকৃতি নেই আমাদের দেশে। তাই আইনের রক্ষক পুলিশ কোনো সন্দেহভাজন তরুণ তরুণীকে দেখলেই হ্যান্ডকাফ লাগায়। তারপর সুযোগ নিয়ে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে, কখনো মেরেও ফেলে। ছেলেটিকে চাপ দিয়ে মালকড়ি হাতিয়ে নেয়। না পেলে ভীষণ পিটুনি দেয়। ভালোবাসার এক ঐতিহাসিক চরিত্র চট্টগ্রামের সীমা চৌধুরী জীবন দিয়ে প্রমাণ রেখে গেছেন চিহ্নিত ভালোবাসার এই শত্রুটিকে।

চার. সমাজ

আমাদের সমাজ জীবন রাষ্ট্রীয় নয়, এখনো পরিচালিত হয় ধর্মীয় অনুশাসনে। কাজেই এ সমাজ খোলা মনে ভালোবাসা মেনে নেয় না। কোনো যুগলকে কোথাও নিভৃতে গল্প করতে দেখলেই ফুসে ওঠে। এরা ভয়ংকর অসুন্দর ভালোবাসা বিদ্বেষী। ভালোবাসার সুকোমল অনুভূতিগুলো সমাজের এই চরিত্রভুক্ত মানুষের কাছে নির্মমভাবে হতাহত হচ্ছে। ভালোবাসার গিভ অ্যান্ড টেক পলিসিতে চিরকাল নারীরা সৎ, পুরুষরা অসৎ। ভালোবাসার প্রথম প্রহরে পুরুষ চায় নারীকে ভোগ করতে। পুরুষের ভালোবাসার পেছনে ওই ভোগ বিষয়টি প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। এদের কাছে ভালোবাসা ত্যাগে নয়, ভোগে।

পাচ. ঘাতক এইডস

এই শব্দটি ভালোবাসার সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু বিশ্বময়। বাংলাদেশে এখনো এইচআইভি বা এইডস ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেনি। তার মানে এই নয়, এটা ছড়িয়ে পড়বে না। এইডস হবার যে সকল কারণ চিহ্নিত তার মধ্যে বাংলাদেশের তরুণ ও মধ্যবসয়ীরা ঘুরপাক খাচ্ছে, বিশেষ করে প্রবাসীদের মধ্যে। অদূর ভবিষ্যতে (এমনটি কামনা করি না) এমনো হয়তো দেখা যাবে, দশজন প্রবাস ফেরত বাংলাদেশির মধ্যে আটজনই এইচআইভি বাহক। তার কারণ হলো ফৃ সেক্স।

অনেকেই মনে করেন, সেক্স ওয়ার্কে কনডম ব্যবহার এইডস এর জন্য নিরাপদ। এটা সত্য হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আমি মনে করি, মোটেও নিরাপদ নয়। সিংগাপুরে যে সকল বাংলাদেশি তরুণেরা নিয়মিত সেক্স করে তাদের মধ্য থেকে দশজনকে প্রশ্ন করে জেনেছি, এরা সেক্সের সময় এইডস সম্পর্কে সচেতন থাকে না অথবা নিয়ম নেমে চলে না। যে পুরুষটি তার পূরুষাঙ্গে কনডম পরিয়ে নারীর সঙ্গে যৌন মিলন করলো তার ঠোটে কনডম নেই। ঠোটে ঠোট, চুমু খেয়ে অন্যের অজান্তে অন্যের দেহে ঢুকে যাচ্ছে মরণ ব্যাধি এইডস। এই তরুণেরা এবং বিবাহিত পুরুষেরা নীরবে ঘাতক এইডস বহন করে ফিরে যাবে বাংলাদেশে এবং তা নির্দয়, নিষ্ঠুরভাবে ছড়াতে থাকবে একান্ত আপনজনদের মধ্যে।

বাংলাদেশের চারপাশে রয়েছে এইডস–এর খনি। দক্ষিণ–পূর্ব কোণে মিয়ানমার, তার পাশে থাইল্যান্ড এবং বাকি তিন দিক ঘিরে থাকা ইনডিয়ায় রয়েছে এইডস–এর ছড়াছড়ি। চারদিক ঘিরে ধীরে অতি ধীরে এগিয়ে আসছে এইডস বাহক দৈত্য দানবেরা, ভালবাসার ফুটন্ত ফুলগুলোর দিকে।

২০০৩–এর *ভালোবাসা* সংখ্যায় *বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা* শিরোনামে এবং ২০০৪–এর ফালগুনি সংখ্যায় প্রকাশিত *সারপ্রাইজ* নামে লেখা দুটিতে এইডস নিয়েই লিখেছি। সারপ্রাইজ–এ লিখেছিলাম পূর্ব পরিচিত এবং পরে এইডস বাহক ফিলিপিন্স নমিতার কথা। তারপর যায়যায়দিন–এর *মেলব্যাগ*–এ চিঠি লিখে অনেক পাঠক জানতে চেয়েছিলেন নমিতার সর্বশেষ অবস্থা।

২০০৪–এর ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে আবারও গিয়েছিলাম ফিলিপিন্সে নমিতাকে দেখতে। ইচ্ছে ছিল ভালোবাসা সংখ্যাটি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো এবং নমিতাকে উপহার দেবো। পারিনি। শেখ হাসিনার নির্দয় হরতালের কারণে সংখ্যাটি ১৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার আসেনি এবং সেই সংখ্যায় আমার লেখাটি ছাপা হয়নি। পরে যখন ছাপা হলো তখন নমিতা বিষয়ক লেখাটি ট্রান্সলেট করে পাঠিয়েছি।

৩০ অক্টোবর শনিবার ২০০৪–এ নমিতা নামের মেয়েটি এ পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নিয়েছে। বাংলাদেশের এক স্বার্থহীন এবং আক্রমণে পরাজিত হলো নিরপরাধ, নিষ্পাপ ভালোবাসা লালনকারী এক নারী নমিতা। সে আমাকে দুটি অনুরোধ করেছিল – এক. তার মৃত্যুর পর যেন ফুল নিয়ে সমাধিতে যাই। দুই. তার ভাইয়ের মেয়েকে যেন সিংগাপুরে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিই।

তার দুটি কথাই রেখেছি।

শুরুতেই বলেছিলাম, ভালোবাসায় দেশ হিসেবে যথাক্রমে বাংলাদেশ, ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া এবং সউদি আরব শ্রেষ্ঠ।

এটা আমার ব্যক্তিগত মত।

ফিলিপিন্স এবং ইন্দোনেশিয়ায় এইডস এখন ব্যাপক বিস্তৃত। সউদি আরবে অনেক আগেই হানা দিয়েছে এইডস। বাংলাদেশ এখনো বিপদগামীর অনেক নিচে রয়েছে। এইডসকে হেলাফেলা করার সুযোগ নেই। প্রয়োজন গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। ফিলিপিন্স ও ইন্দোনেশিয়ায় এইডস প্রবেশ করেছে মেয়েদের মাধ্যমে। ওদের দেশের মেয়েরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত থেকে যৌন স্বাদ নিতে গিয়ে এইডস–এর বাহক হয়ে নিজ দেশে ফিরে গেছে এবং তা পুরুষদের মধ্যে বিলাচ্ছে।

বাংলাদেশ এবং সউদি আরব (গোটা আবর)–এ পুরুষ দ্বারা এইডস ছড়াচ্ছে এবং ছড়াবে। জীবন–জীবিকার প্রশ্নে বাংলাদেশিরা বিশ্বময় ছড়িয়ে রয়েছে। কে কখন কোথায় এইডস–এর বাহক হয়ে যায় তা বলা মুশকিল। বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। এই নারীদের দিকেই ধেয়ে আসছে এইডস। এদেরকে এইডস থেকে বাচাতে প্রত্যেক প্রবাস ফেরত চাকুরীজীবী, সরকারি আমলা, ব্যবসায়ী, এক কথা সকলেরই বাধ্যতামূলক রক্ত পরীক্ষা করা আজ সবচেয়ে জরুরি।

এ লেখা পড়ে প্রবাস ফেরত অনেকেই মনঃক্ষুণ্ন হবেন। সকলেই এইডস বাহক নয়। কিন্তু আমরা সকলেই (প্রবাসী) এইডস–এর পাশাপাশি বসবাস করছি। একজন এইডস বাহক পুরুষ, একজন নিরপরাধ, নিষ্পাপ মেয়েকে এইডস আক্রান্ত করে তিলে তিলে হত্যা করার কোনো অধিকার নেই। এইডস আক্রান্ত ফিলিপিন্স নমিতার কষ্টগুলো খুব কাছ থেকে দেখেছি। এর চেয়ে তীব্র কষ্ট, যন্ত্রণা মানবজীবনে আর নেই। নমিতা হাসি খুশি নিয়ে এই পৃথিবীতে আরো অনেক বছর হয়তো বেচে থাকতো ঘাতক এইডস তাকে ছিনিয়ে নিল।

নারী পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্রতম একটি শব্দ। এর কাছে আমাদের যেতে হয় মাতৃস্নেহ, বোনের আদর অথবা প্রেমিক হিসেবে ভালোবাসার জন্য।

ভালোবাসার এই দিনে আসুন, বাংলার নারীদের এইডস–এর ভয়াল আক্রমণ থেকে রক্ষা করি। নিজে বাচি এবং ওদেরকেও বাচতে দিই।

নিরাশ আধারে আশার আলো।

যায়যায়দিনই ভালোবাসা দিবস উদযাপন এবং এর ওপর পাঠকদের তৈরি লেখা প্রকাশের প্রথম প্রচলন করে। সীমাহীন বেকারত্ব, হতাশা, রাজনৈতিকদের তৈরি সমস্যায় তরুণ–তরুণীসহ সকল শ্রেণী মানুষ যখন জীবন

যন্ত্রণায় ছটফট করছে তখন নিরাশার আধারে এক চিলতে আলোর পরশ নিয়ে এগিয়ে এসেছে যাযাদি তথা শফিক রেহমান।

ভালোবাসাহীন জীবন কেবলই অর্থহীন। মানুষের রুক্ষতা, ক্ষুব্ধতা, ক্রোধকে ভুলে গিয়ে ভালোবাসার সুরভিতে, জীবনের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে যাযাদি।

এই হাতছানি যেন থাকে চিরদিন। আজ এবং আগামী প্রজন্মের অনাগত তরুণ–তরুণীদের প্রতি যাযাদির ভালোবাসার এই স্বাগত আহ্বান, নিরাশ আধারে আশার আলো।

বার্ড পার্ক রোড, সিংগাপুর থেকে

স্বপ্ন

- ফতে মোল্লা

সাতাশ বছর আগের আবু ধাবি। আজকের মতো দ্বীপান্বিতা সৌধ শ্রেণী সংকলিতা নয়। ধুধু মরুভূমির মধ্যে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী ছোট ছোট কুড়ে ঘরে ঢাকা ছোট্ট শহরে কয়েকটা মাত্র দালান। দুই রুমের এমনি এক কুড়ে ঘর *ভাঙাবাড়ি* নামে বিখ্যাত। বাঙালিদের ব্যাচেলর মেস। তার একটা রুমে খাটে দুজন আর মেঝেতে একজন, এভাবে থাকে বাড়ির ভাড়াটে তিন কিশোর। বাকি ঘরটা রাখা আছে রাজ্যের অনাথ–অতীত, অধম–পতিতদের জন্য যাদের চাকরি নেই, ভিসা নেই, কারো আবার পাসপোর্টও নেই। সে বাসায় একদিন সান্ধ্য আড্ডা বসেছে। আড্ডা জিনিসটা সব দিন জমাট হয় না। কিন্তু সেদিন আড্ডা জমেছে তুমুল। মরুভূমির ভাঙাবাড়ি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বাঙালি কিশোরদের প্রাণবন্ত কণ্ঠে ... কামাল, বিনয়, শান্তি, আলো, মমতাজ, কাজী, রিজওয়ান .... ঘরের চুন ওঠা দেয়ালে বয়সহীন এয়ারকন্ডিশনার কাজ করে চলেছে আশ্চর্য নিঃশব্দে। বাইরে গরম কিন্তু ঠাণ্ডায় চমৎকার ঘরের ভেতরটা।

ধড়াম করে দরজা খুলে ঢুকলো কেউ ধড়াম করে দরজা বন্ধ করলো। রুদ্ধশ্বাসে দুই চোখ তার বিস্ফারিত। মহা আনন্দে নয়, ঘোর আতংকে। একটু আগে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেচে গেছে সে। সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে রাস্তা পার হতে গিয়ে কানের কাছ দিয়ে সাই করে বেরিয়ে গেছে মাইক্রোবাস। একটু এদিক–ওদিক হলেই মাথা ফেটে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়তো রক্তাক্ত মগজ।

তারপর আড্ডায় এই রকম কথা হল।

জাপানিজ স্কুলের মাইক্রোবাস। নাম লেখা আছে গায়ে। স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে যাচ্ছিল বাসায় বাসায় পৌছে দেবার জন্য।

জাপানিজ, ছাড়াও বৃটিশ, আমেরিকান সবাই নিজেদের স্কুল বানিয়েছে এখানে। স্কুলগুলোর নিজস্ব মাইক্রোবাসে ওরা বাচ্চাদের আনা–নেয়া করে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশিদের স্কুল নেই। আমাদের বাংলাদেশিদের স্কুল নেই কেন?

আমাদেরও স্কুল চাই। হ্যা হ্যা, আমাদেরও স্কুল চাই ...।

সারা রাত ধরে মরুতামসের আকাশে–বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল নামহীন কিছু কিশোরের স্বপ্ন – *আমাদেরও স্কুল চাই ..... আমাদেরও স্কুল চাই ..... আমাদেরও স্কুল চাই .....।* তারপর অলক্ষ্যে কোথায় কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিল আকাশের গ্রহ–তারা।

পরদিন সেই উচ্চ শিক্ষাহীন, উচ্চ চাকরিহীন ছেলেগুলো তাদের স্বপ্ন নিয়ে হাজির জালালভাইয়ের বাসায়। সিলেটের সুদর্শন যুবক, পাওয়ার হাউসের ইঞ্জিনিয়ার। কি? না, আমাদেরও স্কুল চাই। মন দিয়ে তিনি শুনলেন কথাগুলো, যেন দিব্যচোখে দেখলেন এবং স্পর্শ করলেন স্বপ্নটা।

তার পরদিন সদলবলে সবাই গিয়ে পড়লেন গোলাম রহমানের অফিসে স্কুল প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। কিছু লোক থাকে যাদের বয়স অনুমান করা দুঃসাধ্য। ছিপছিপে এ বুড়ো এ বয়সেও দেবানন্দের মতো রূপবান

সরস যেন আঙুর থেকে কিসমিস হয়েছেন। সিলেটের লোক, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। রিটায়ার করতেই বাঙালি ধনকুবের জহুরুল ইসলাম তাকে হাইজ্যাক করে এনে বসিয়ে দিয়েছেন তার আবু ধাবির বিখ্যাত কনস্ট্রাকশন কম্পানি *বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কর্পরেশন*–এর কর্ণধার হিসেবে।

কিন্তু বলতে গেলে তিনি দুর দুর করেই তাড়িয়ে দিলেন সবাইকে। বড় কাজ করতে চাও, শুরুতেই ভজঘট। যাও, ফিরে যাও আজ। তারপর টেলিফোনে আমার সেক্রেটারিকে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বানাও, সেই মোতাবেক এসে দেখা করো।

বিল্ডিংয়ের বাইরে এসে কে যেন ভ্রূ কুচকে সন্দেহে বললো *বুড়া হালায় আমাগো অপমান করলো নাকি রে?*

কে যেন দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে জবাব দিল, *বুঝতাছি না দোস্ত। হালায় অরিজিনালি আছিল বৃটিশের সিএসপি, সিসটেম ছাড়া কিছুই বুঝে না।*

দুদিন পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট মাফিক যখন তার অফিসে সবাই তখন রাজকীয় নাস্তায় ভরপুর টেবিল আর তার সুগন্ধে মৌ মৌ অফিস ঘর। সেই থেকে প্রায় দুই বছর যেভাবে নেতৃত্ব দিলেন তিনিই তাতে সাংগঠনিক ট্রেনিং এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় ভরে উঠল আমাদের ঝুলি। সে জন্য তার কাছে আজও আমি কৃতজ্ঞ। সেদিন তিনি প্রথম কাজ দিলেন, কতো ছাত্র আমরা জোগাড় করতে পারবো, শিক্ষক কোথায় পাবো, স্কুল কোথায় হতে পারে এসব রিপোর্ট দিতে।

সারা সপ্তাহ প্রচুর ঘোরাঘুরি করে পরের মিটিংয়ে গদ গদ খুশিতে রিপোর্ট দিলাম, আটাশজন ছাত্র–ছাত্রী পাওয়া গেছে। যেন হাতে চাদ পাওয়া গেছে! আর ভাবীরা সবাই বড় বড় পরীক্ষা পাশ করে এসে কেবল ঘন্টা ধরে ফোনে আড্ডা দেন এবং নিমন্ত্রণ দাওয়াত খান। তারা খুশি মনে রাজি হয়েছেন বিনা পয়সায় মাস্টারি করতে।

অপ্রত্যাশিত ভিটো দিয়ে বসলেন নেতা। বিনা মূল্যের মাস্টার দিয়ে শিক্ষা হয় না। ওসব ফাকিবাজি চলবে না, মাস্টারদের বেতন দিতে হবে।

মাথায় বাড়ি পড়লো আমাদের। বলে কি লোকটা! আটাশজন ছাত্র দিয়ে বেতন কিভাবে দেবো? এমন বোকামির কোনো মনে হয়, বিশেষ করে ভাবীরা নিজেরাই যখন পয়সা ছাড়া রাজি! মাথা চুলকে বেরিয়ে এলাম সবাই। ভাবীদের বললাম, উপায় নেই, নামমাত্র হলেও কিছু বেতন নিতেই হবে।

ভাবীরা অগত্যা রাজী হলেন। মাসে পাচশ দিরহাম করে নেবেন তারা প্রত্যেকে।

পরের সপ্তাহের মিটিংয়ে আবার ভিটো দিয়ে বসলেন বুড়ো। অন্যান্য স্কুলে সর্বনিম্ন কি বেতন দেয় সে খবর নিয়ে এসো। হুবহু সেই বেতনই দিতে হবে। কারণ আন্তর্জাতিক সমাজে বাঙালি স্কুলকে কেউ যেন মিসকিন না বলতে পারে।

শস্তার লোভে এই জরুরি কথা ভোলেননি আমাদের দূরদর্শী নেতা। কিন্তু অন্যান্য স্কুলে খবর নিয়ে আবার আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হলো। ইওরোপ–আমেরিকা–জাপানের কথা থাক, পাকিস্তানি স্কুলের মাস্টারদের বেতনটাই বারো–তেরোশ দিরহাম মাসে। এতো পয়সা আমরা কোথায় পাবো?

পরের মিটিংয়ে রিপোর্ট দিয়ে মুখ হাড়ি করে বসে রইলাম আমরা। কিন্তু উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন বুড়ো। সিদ্ধান্ত লেখা হলো, আমাদের মাস্টাররা মাসে ওই বেতনই পাবেন।

কে যেন খুশি হয়ে বললো, তার মানে আপনার কম্পানি এ টাকাটা দেবে?

শুনে হাই পাওয়ারের চশমার ভেতর থেকে জ্বলজ্বলে আলুচেরা চোখে তাকালেন তিনি। বললেন, দয়ার দান নেবে না বাংলাদেশ স্কুল। আর উপহার দিতেও যোগ্যতা চাই, ওটা এখনো নেই আমাদের।

তাহলে? জালালভাইসহ আমাদের চোখে তখন হাজার সর্ষে ফুল। টাকাটা আসবে কোত্থেকে?

তিনিই সমাধান দিলেন। আপাতত অর্থেক বেতন ক্যাশ নেবেন মাস্টাররা, বাকি অর্ধেক খাতায় লেখা থাকবে দেনা হিসেবে। যদি কোনোদিন স্কুল নিজের পায়ে দাড়ায় তবে সে দেনা শোধ করতে হবে অবশ্যই সর্বপ্রথম অন্য কিছু করার আগে।

এটা আদতেই কোনো সমাধান কি না তা ও বয়েসের মাথায় ঢুকলো না, কিন্তু গিট্টুটা তো খুললো। চিঠি লিখে দিলেন তিনি। মদিনা জায়েদের আরবি স্কুলের হেড মাস্টারের কাছে। সকাল আটটা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত তোমাদের আরবি স্কুল, তারপরে পুরো দালানটা খালি পড়ে থাকে। আমাদের অনুমতি দাও, আমরা বাংলাদেশ স্কুল খুলবো চারটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত।

তখনো আবু ধাবিতে স্কুল-বোর্ডের আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠেনি, হেড মাস্টারই স্কুলের সর্বেসর্বা। এমন অনুরোধ হেড মাস্টারের জীবনে এই প্রথম। আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন লোকটা। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এ আর বলতে, তালিমই মানুষকে মানুষ বানায়, না হলে মানুষ গাধা থেকে যায়। যাও, বিকেল থেকে স্কুল তোমাদের সম্পত্তি। পানি, বিদ্যুৎ সব ফ্রি করাই আছে সরকার থেকে। দারোয়ানকে বলে দিচ্ছি, ও সব দেখাশোনা করবে, সম্ভব হলে ওকে দুই চার দিরহাম *বখশিশ* দিও। দারোয়ানটা ইয়েমেনি, বাসা তার স্কুলের পাশেই।

সেই একটা আশ্চর্য দিন এসেছিল মরুভূতিতে। সেই এক মাহেন্দ্রক্ষণে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ স্কুল। বিস্ময়ে সেদিনের সূর্য দেখেছিল, স্কুলের আঙ্গিনায় বালুর মধ্যে আনন্দের ছুটোছুটি করছে আমাদের আটাশটা বাঙালি বাচ্চা। বাংলায় হাসছে বলছে, খুনসুটি করছে, দৌড়াদৌড়ি করে খেলছে আর স্কুলের ক্লাসে বাংলায় পড়া শেখাচ্ছেন বাঙালি শিক্ষয়িত্রী। এদিক-ওদিক দাড়িয়ে উপভোগ করছেন কিছু উৎসাহিত অভিভাবক। সবচেয়ে উল্লসিত সেই ইয়েমেনি দারোয়ান। মহা উৎসাহে ঘুরে ঘুরে বাচ্চাদের দেখাশোনা করছে, ওদের ফেলা ময়লা হাসিমুখে পরিষ্কার করছে। আজ মনে হয় লক্ষ দিরহামেও শোধ হতো না ওই বিদেশি লোকটার ওই স্নেহ, ওই সহাস্য পরিশ্রম। কয়টা দিরহামই বা ওকে আমরা দিতে পেরেছি!

ফয়জুল্লাভাবী (পতির নামে সতীর নাম) হলেন হেডমিস্ট্রেস। আবু ধাবিতে চালু হয়ে গেল বাংলাদেশ ইসলামিক স্কুল। সঙ্গে রইলেন অন্যান্য ভাবীরা যেন উৎসবের বন্যা বয়ে গেল সারা শহরে। এতোদিন যারা পড়শোনার অসুবিধার জন্য বৌ-বাচ্চাদের দেশ থেকে আনতেন না, এবার তারা ইমিগ্রেশন অফিসে ছুটলেন পরিবারের ভিসার জন্য।

চুম্বকের মতো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গোলাম রহমানের বশবিদ্যা জানা ছিল। বশ হলেন জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার এবং রাষ্ট্রদূত। অনতিবিলম্বে শুরু হয়ে গেল চাদাবাজি। জনতা ব্যাংকে আর এমবাসিতে পা ঠেকালেই দিতে হচ্ছে পাচ দিরহাম করে স্কুলে চাদা। ব্যাপারটা বেআইনি কিন্তু গরজ বড়ই বালাই। অনতিবিলম্বে শোধ হয়ে গেল ভাবীদের বকেয়া বেতন।

সেই শুরু। এরপরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী বাড়লো, স্কুল-কমিটি বানানো হলো। সম্ভবত জালালভাই প্রেসিডেন্ট হলেন আর আমরা মাঠকর্মী। পরে কি এক কারণে মদিনা জায়েদ থেকে রোদা ক্লিনিকের পাশে আরবি স্কুলে চলে গেল আমাদের স্কুল। সেখানে শুধু বাচ্চাদের নিয়ে করা হলো বিচিত্রানুষ্ঠান, সঙ্গে রইলেন এমবাসির কমার্শিয়াল অ্যাটাচি হেলালভাই ও ভাবী। লেবার অ্যাটাচি সুগায়ক বোরহানভাই ও তার সুগায়িকা স্ত্রী স্কুলের একটা মর্মসঙ্গীতই তৈরি করলেন। সঙ্গে রইলো আমাদের লালদা (সরিৎ কুমার লাল) ও তার স্ত্রী, অন্যান্য গায়িকা বুলবুল মহলানবীশ যার একক কনসার্ট হতো মিলনায়তনে, যার পরিশীলিত সুকণ্ঠের রাগ ভিত্তিক গান সারা রাত ধরে শোনার মতো।

এদিকে প্রেসিডেন্ট শেখ জায়েদ জানালেন আমরা যতো টাকা তুলবো তিনি ততো টাকা দেবেন। কালক্রমে অনেক টানাহ্যাচড়ার পর শেখের এক বাঙালি বন্ধুর মাধ্যমে সরকার থেকে স্কুল তার নিজস্ব জমি পেল মরুর নামের এলাকায়। বিল্ডিং তৈরির নকশা কম পয়সায় করে দিল শামসুল আলমভাইয়ের আর্কিটেকচার কম্পানি। তালপাতার সিপাই শরীর নিয়ে সিনহাদা' দিন-রাত খাটলেন এ নিয়ে। তারপরে একের পর এক

স্কুলের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন কারা যেন, তারপরে টেলিফোনের পদস্থ অফিসার ফজলুর রহমান। এরপরে একই সঙ্গে স্কুলের প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও বাংলা নাট্যগোষ্ঠির নেতা হলেন সকলের প্রিয় ড. জাফর সাদিক, অনন্য এক বাঙালি দশভুজ।

দিনে দিনে ফুলের মতো ফুটে উঠলো স্কুল। বর্ষার পুকুরে প্রাণবন্ত কলমি শাকের মতো বেড়ে উঠলো দেখতে দেখতে। এতোটাই বেড়ে উঠলো যে, পেশাগত শিক্ষাবিদের দরকার হলো। বাংলাদেশ থেকে ভিসা দিয়ে আনানো হলো ঢাকার ল্যাবরেটরি স্কুলের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ মি. শামিমকে। তার অভিজ্ঞ হাতে একেবারে যেন আকাশ ছুয়ে ফেললো বাংলাদেশ ইসলামিক স্কুল। দুঃখের কথা, প্রায় দুই বছর পর হজ করতে গিয়ে তিনি পোশাক পাসপোর্ট পেছনে রেখে লুঙ্গি-চপ্পল পরে এমনই হারিয়ে গেলেন যে, আর কোনোদিনই তার খোজ পাওয়া যায়নি। অনেক হাত বদলের পর কমিটির জিএস হিসেবে শক্ত হাতে হাল ধরলেন নাসরুল ওয়াহিদভাই, এক অসাধারণ নেতা। কয়েক বছরের প্রচণ্ড পরিশ্রম আর তীক্ষ্ম নেতৃত্বে স্কুলকে একেবারে তুঙ্গে পৌছিয়ে তিনি বিদায় নিলেন কানাডার নাগরিকত্ব নিয়ে।

আজ কয়েক একর জমির ওপরে সে স্কুলের সুবিশাল দালান। যে স্কুলের মাস্টারের অর্ধেক বেতন ছয়শ দিরহাম খাতায় বাকি লিখতে হয়েছে, আজ সে স্কুলের একাউন্টে ফিক্সড ডিপজিট আছে আট লাখ দিরহাম। আগে যে বাংলাদেশিরা পাকিস্তানি বা ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মিলনায়তনে বিচিত্রানুষ্ঠান করতে বাধ্য হতো, এখন তারা নিজেদের স্কুলে শক্তিশালী শব্দ-যন্ত্রের সুবিশাল মিলনায়তনের একুশে, ছাব্বিশে এবং ষোলই উদযাপন করে।

আটাশ দিয়ে শুরু হয়েছিল যার, আজ সে স্কুলে প্রায় চারশ ছাত্র-ছাত্রী! কি অবিশ্বাস্য, ছোট্ট কিছু ক্লাস নিয়ে জন্ম হয়েছিল যার, আজ সে স্কুলে ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা হয়, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাও হয়! ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ঢাকা বোর্ডের প্রশ্নপত্র আসে, ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে পরীক্ষার খাতা ঢাকা বোর্ডে ফেরত যায়। এমবাসির অফিসারেরা পরীক্ষা হলে টহল দেন। এতো সাফল্য, এতো সুখ আমরা রাখবো কোথায়!

আর আজ বাচ্চাদের আনা-নেয়া করে স্কুলের নিজস্ব বড় দুটো বাসের সঙ্গে ভাড়া করা আরো পাচটা মাইক্রোবাস।

মাইক্রোবাস! মাইক্রোবাস!

যা থেকে দীর্ঘ সাতাশ বছর আগে এই স্কুলের স্বপ্ন দেখেছিল কিছু নাম না জানা পরিচয়হীন বিত্তহীন কিশোর, ঝাপিয়ে পড়েছিল অসাধ্য সাধনে!

কিছু ব্যর্থতাও আছে, আছে কিছু বেদনা। কিন্তু সে কথা থাক। সাফল্য আর সুখের প্লাবনে আজ ঢাকা পড়ে যাক সব কিছু। সেই স্বাপ্নিক কিশোরের দল এখন জীবনের ধাক্কায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে চারদিকে। কারো চোখে আজ নতুন কোনো স্বপ্ন ঝিকমিক করে কি না জানি না। আবু ধাবির এক দ্বীপে চাকরির নামে নির্বাসনে আছে বিনয়, কামাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফ্লোরিডায়। রিজওয়ান ও মমতাজ থাকে কানাডায়, আলো এখন দুবাইয়ের এক কম্পানির কর্ণধার। শান্তি নামের সবচেয়ে নরম ছেলেটা দেশে ফিরে জাহাজ কাটার ব্যবসা করছে। ফয়জুল্লাহভাই, শামসুল আলমভাই, ফজলুর রহমানভাই কোথায় আছেন জানি না। হেলালভাই ঢাকায় ব্যবসা করেন। বুলবুল মহলানবীশ দেশে ফিরে সংস্কৃতির জগতে ব্যস্ত। বোরহানভাই বাংলাদেশে পুলিশের সর্বাধিনায়ক ইন্সপেক্টর জেনারেল হয়েছিলেন। টেলিভিশনে এখনো গান করে থাকেন স্বামী-স্ত্রী। জাফরভাই এখনো আবু ধাবিতে। দুই যুগ পরে এসে সম্প্রতি নিজের গড়া স্কুলের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন জালালভাই। বৃত্তাকার জীবন!

আর গোলাম রহমান? আমাদের সেই কট্টর, অথচ স্নেহময় এবং দুরদর্শী অভিজ্ঞ নেতা? এক জালালভাই ছাড়া আমাদের মতো একপাল ছন্নছাড়া অনভিজ্ঞদের নিয়ে এক অনন্য প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়ে গেছেন যিনি

অবিশ্বাস্য নেতৃত্বে, তার দান কি করে ভুলবে আবু ধাবির বাংলাদেশিরা! তিনি নশ্বর দেহ রেখেছেন কয় বছর আগে। আজ তিনি নেই, স্কুলে তার একটা ছবিও নেই। কেউ খেয়াল করেনি কথাটা দীর্ঘ সাতাশ বছরে।

পৃথিবীতে শতকরা নিরানব্বইজন মানুষের শতকরা নিরানব্বইটা স্বপ্ন কখনো সফল হয় না। তবু স্বপ্ন থাকতে হয়, স্বপ্নই জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি। সবার জীবনে কিছু অন্ধকার থাকে যাতে মনে হয় কোথাও কোনো আলো নেই। আবার কিছু আলোও থাকে যাতে মনে হয় কোথাও কোনো অন্ধকার নেই। মরুভূমির ওপরে গর্বিত দাড়ানো ওই বিশাল স্কুল, সারি সারি ওই ক্লাসরুম, ওই ল্যাব, ওই মিলনায়তন, ওই বাংলা বিদ্যাপিঠ আমাদের সেই আলো, সেই দিকবর্তিকা।

না-ইবা থাকলো কোনো ফটোগ্রাফ সেই স্বাপ্নিক কিশোরদের, না-ইবা থাকলো কোনো দলিল। না-ইবা মনে রাখলো কেউ, কিছু আসে যায় না তাতে। যেমন কিছু আসে যায় না যদি এ নিবন্ধে নাম-তারিখের কোনো ছোটখাটো ভুল থাকে, কোনো নাম বাদ পড়ে থাকে। এই হলো সেই স্বপ্ন যেখানে কেউ আওয়ামী লীগ-বিএনপি নয়, জামায়াত বা জামায়াত বিরোধী নয়। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। এখানে সবাই মাতৃভূমির সন্তান, মাতৃভাষার সন্তান। সবাই যে যা পারে করেছে, যে যা পারে দিয়েছে। নিজের দুই কড়ি দিয়ে সবাই মাতৃভূমি আর মাতৃভাষার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছে। তাই তো বিদেশের বালুতে গড়ে উঠতে পেরেছে জাতির মর্মর বিদ্যাকেন্দ্র! আবু ধাবিতে যদি হতে পারে, হতে পারে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যদি চোখে স্বপ্ন থাকে। স্কুল যদি হতে পারে, হতে পারে যে কোনো বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান যদি চোখে স্বপ্ন থাকে।

বুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলে অনেক স্বপ্নকেই বাস্তব মনে হয়, অনেক বাস্তবকেই স্বপ্ন মনে হয়। আবু ধাবির ওই বিশাল বাংলাদেশ স্কুলকে যেন স্বপ্ন মনে হয় আজ এই সাতাশ বছর পরেও। ওখানে ছিলাম আমি ... মরুভূমির সেই মায়াময় ভাঙাবাড়ি .... সেই সন্ধ্যার আড্ডা .... জাপানিজ স্কুলের সেই মাইক্রোবাস .... আর সেই দুই চোখ ভরা স্বপ্ন ....।

আবু ধাবির অভ্রভেদী গর্বিত বাংলাদেশ স্কুল!

আবু ধাবি থেকে
fatemolla@hotmail.com

বিভেদ

– জিনিয়া

১৯৯৫ সালের শেষের দিকে হঠাৎ আব্বা মারা গেলেন। আমি তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী। সুস্থ মানুষ, সকালে অফিস গেলেন। কিন্তু বাসায় ফিরতে পারলেন না। আমরা মোট তিনজন থেকে গেলাম। আম্মু, আমি আর এক ভাই।

আমি বড়। আম্মা ছিলেন গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু কাছের একটা স্কুল ছাড়া ভালো কোনো চাকরিও করতেন না। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পরিবার অসহায়ত্বের কবলে পড়লো। তারপরেও এসএসসি পরীক্ষা দিলাম। আশা ছিল স্টার মার্কস পাবো, অল্পের জন্য সেটা হলো না।

লেখাপড়া চালিয়ে গেলাম। এইচএসসি পর্যন্ত সব রকম প্রতিকূলতা আম্মা একাই সামাল দিতেন। বাস্তবতার কঠিন আঘাত বোধ করি আমার মনে তখনো লাগেনি। কিন্তু বুঝতে সময় লাগলো না এই পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা। চিন্তা ভাবনা ছিল, আর যাই করি লেখাপড়া শেষ করবো, নিজের পায়ে দাড়াবো এবং যা কিছু করি এ সংসারের জন্যই করবো।

আমার ভাবনার, ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুই ছিল আমাদের এই সংসার। তিনজনের এ সংসারে কোনো বিভেদ নয়, মিলেমিশে, সুখে-দুঃখে থাকার চিন্তাই থাকতো আমার মাথায়। ভাবতাম ছোট ভাইটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবো। ভালো করে লেখাপড়া শিখবে, আম্মার কষ্ট দূর হবে। কোনো রকম প্রস্তাব মনের

কোনো ঠাই দিইনি এই ভেবে যে, আমি বড়, আমার দায়িত্ব অনেক। মেয়েদের সীমাবদ্ধতা জয়ের চিন্তা করতাম।

আসলে ছেলেরা নিজের পেশি শক্তি, ভরাট কণ্ঠ এসবের কারণেও যে নিজেকে পুরুষ ভাবে এবং মেয়েদের দূর্বল ভাবে প্রতিনিয়ত তা বুঝতে পারলাম যখন শুধুমাত্র মেয়ে বলেই অর্থাৎ বোন বলেই ছোট ভাইয়ের হাতে ক্রমাগত ছোট হতে থাকলাম। মনে হতে লাগলো, আমি যদি বোন না হয়ে ভাই হতাম, আমার যদি শক্তি থাকতো তবে নিশ্চয়ই আমার কাজগুলোর মূল্যায়ন করতো। আমাকে এভাবে ছোট হতে হতো না।

আমার সুযোগ ছিল মিষ্টি কথার মোহে নিজেকে মোহিত করে নিজের মতো করে নিজেকে সাজানোর। কিন্তু আমি কখনোই তা চাইনি। সংসারকে এতো বেশি ভালোবাসতাম যে, কখনো নিজেকে আলাদা করিনি। কখনো নিজের কোনো শখের কথাও আম্মাকে বলিনি। সংসারের প্রয়োজনে দুবার চাকরিও করেছি। তবে নিজের জন্য কিছুই রাখিনি। এসব কথা কখনোই বলতাম না যদি না আমার ভালোবাসার সংসার আমাকে এভাবে কষ্ট না দিতো।

সব রকম আবেগ, অনুভূতি যে সংসারের সঙ্গে জড়িত! যাকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখতাম সেটাই এখন ধ্বংসের পথে। লেখাপড়া নিয়ে যে আশা আমার ছোট ভাইকে নিয়ে করতাম তার ধারেকাছেও সে যেতে পারেনি। মানে বোনকে তুচ্ছ ভাবে, খাট করে। কখনো চিন্তাও করে না তার বাবা নেই। সত্যিই মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক।

এ পর্যায়ে এসে নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হয়, একা মনে হয়। এখন মনে হয় নিজের জন্য না ভেবে ভুলই করেছি। কিন্তু আম্মা! তার জীবনটা তো আরো কষ্টের। আমার তো স্বপ্ন দেখার সুযোগ আছে। সুন্দর স্বপ্ন নিয়ে, আশা নিয়ে আরো দিন পার করতে পারবো। কিন্তু আম্মার কি হবে? তার ছেলে তো তাকেও অবমূল্যায়ন করে। প্রতিনিয়ত ছোট করে। আম্মার কথা ভাবলে আমার নিজেকে নিয়ে ভাবাও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এখন মাঝে মধ্যে মনে হয় যদি এমন কেউ থাকতো শুধু এটুকু বলতো, *জীবন তো এমনই। আমি আছি তো!*

আমি জানি সব ক্ষেত্রেই আছে ভালোবাসা অবমূল্যায়িত হওয়ার আশংকা। যদিও এখন ভাবছি আমার কোনো সুহৃদয়ের কথা যে আমাকে বুঝবে, আমার সুখ-দুঃখের অংশীদার হবে। কিন্তু সেখানেও যে আমাকে আশাহত হতে হবে না তা-ই বা কে জানে! আপন ছোট ভাই যখন একটি সংসারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয় যে কি না ছোটবেলা থেকে দেখলো, জানলো ....।

পৃথিবীতে আসলে ভালো মানুষের এখন খুব প্রয়োজন। ভালো মানুষ, যে সব কিছু পজিটিভলি দেখে! মানুষের মনুষত্ব বোধ, মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে বিচার করে। ভালো মানুষ যার মধ্যে শঠতা নেই, হিংসা নেই, অন্যকে ছোট করার কোনো প্রবণতা নেই। এ রকম মানুষ দরকার। এ রকম মানুষ কি সত্যিই আছে?

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে

দরজা বন্ধ

- হেলাল

মানুষের বিয়ে অনেকভাবে হয়। যেমন লাভ ম্যারেজ, কোর্ট ম্যারেজ, জানাশোনার মধ্যে ম্যারেজ, অভিভাবকদের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে ম্যারেজ। এই রকম অনেক প্রকার বিয়ের কথা আপনারা জানেন। তবে আমি এখানে এক জাতীয় বিয়ের কথা বলবো যার নাম *দরজা বন্ধ* ম্যারেজ।

কিছু দিন আগেই আমাদের বাড়ির পাশে এই রকম একটি বিয়ের কাজ সম্পন্ন হলো। একটি বহুল পরিচিত প্রবাদ আছে, *বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবার ঘুঘু তোমায় বধিব পরাণ।*

ঘটনাটি কতোকটা সেই রকম।

আমাদের বাড়ির পাশে ফাতেমাআপার সঙ্গে ঢাকায় চাকরি করে এ রকম এক ছেলের সম্পর্কের কথা জানতাম। আমরা সবাই জানি সেই ছেলেটির সঙ্গে ফাতেমাআপার বিয়ে হচ্ছে।

এ রকম কথা শুনতে শুনতে দুই বছর পার হলো। কিন্তু বিয়ের কোনো নাম–গন্ধ নেই।

যেদিন ঘটনা ঘটলো তার তিন চার মাস আগ পর্যন্ত ছেলেটিকে আমরা এলাকায় দেখিনি। এদিকে এলাকায় হালকা গুঞ্জন উঠলো যে, ছেলেটি কেটে পড়ার চিন্তা ভাবনা করছে।

এর দুই তিন সপ্তাহ পর এক সন্ধ্যায় হঠাৎ খবর এলো, আজ ফাতেমাআপার বিয়ে। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরাসহ এলাকার চেয়ারম্যান, মেম্বাররা তাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে। কাজিও উপস্থিত।

ছেলে কোথাকার এসব আলোচনা করতে করতে ফাতেমাআপাদের বাড়িতে গেলাম। দেখি, ফাতেমাআপার শোবার ঘরে বেড়ার ফাক দিয়ে অসংখ্য চোখ ভেতরে নজর ফেলছে।

দরজায় এগিয়ে গিয়ে দেখি, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। অর্থাৎ সেই ছেলে আজ পড়ন্ত বিকেলে ধান খাওয়ার জন্য এসেছিল। তাকে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিকে খবর দেয়া হয়েছে।

মহা ধুমধামের সঙ্গে সেই রাতেই ফাতেমাআপার বিয়ে হয়ে গেল।

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ থেকে

সাইরেন

কামরুল ইসলাম খান

ভালোবাসা শব্দটির সঙ্গে মায়া, মমতা, আদর, আবেগ, পরম আনন্দ যেমন জড়িত তেমনি প্রতারণা, ধ্বংস অনিবার্য, করুণ পরিণতি ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কেউ ভালোবেসে আকণ্ঠ সুখ ভোগ করে আবার কেউ ভালোবাসার মর্মজ্বালায় তুষের আগুনের মতো নিরন্তর দগ্ধ হতে থাকে। ভালোবাসার এই দ্বিমুখী আচরণ দেখলে অনেকেই প্রথমে ভয় পায় ভালোবাসতে। তবুও বছর ঘুরে ভ্যালেনটাইনস ডে আসে। তাই আমাদের ভালোবাসতে ইচ্ছা করে।

ভালোবাসার নিজস্ব শক্তিই মানুষকে প্রেমে পড়তে সাহায্য করে। এ যেন সাইরেনের মতো সুন্দর সামুদ্রিক প্রাণী। গৃক মিথোলজি থেকে যতো দূর জানা যায়, সাইরেন অর্ধেক মানবী এবং অর্ধেক পাখি এক মোহময়ী প্রাণী। সে তার মোহনীয় সুরের জাদুতে সমুদ্রে চলাচলকারী নাবিকদের বিভ্রম সৃষ্টি করে ধ্বংস সাধন করে। সে জন্যই বোধহয় ফ্রান্সিস বেকন ভালোবাসার স্থান নির্ধারণ করেছেন স্টেজে। তার মতে, সামাজিক জীবনে এর উপকারিতা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ভালোবাসা এবং জ্ঞানী হওয়া একই সঙ্গে সম্ভব নয়।

ভালোবাসার মতো তুচ্ছ ঘটনার জন্যই ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছিল। অলিম্পাস পর্বতের ঝগড়ার দেবী একদিন একটা আপেল ছুড়ে দিয়েছিল জুনো (শক্তির দেবী), মিনারভা (প্রজ্ঞার দেবী) এবং ভেনাস (সুন্দরের দেবী)–এর মাঝে যাতে লেখা ছিল সবচেয়ে সুন্দরীর জন্য। নিজেদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরীকে নির্বাচনের জন্য তারা ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিসকে নিয়োগ করলো। প্রত্যেক দেবীই যার যার সাধ্যমতো প্যারিসকে ঘুস অফার করেছিল। যেমন জুনো করেছিল শক্তি সম্পদ, মিনারভা করেছিল প্রজ্ঞা এবং ভেনাস অফার করেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর রমণীকে। সুন্দরের মোহে পড়ে প্যারিস স্বাভাবিকভাবেই রায় দিয়েছিল ভেনাসের পক্ষে। ভেনাস–এর কুপরামর্শে প্যারিস মেনেলাস পত্নী হেলেন (পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী হিসেবে বিবেচিত)–কে প্ররোচিত করে ট্রয়ে নিয়ে যায়। ফলে ধ্বংসাত্মক ট্রয় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। প্যারিস এভাবে হেলেনকে অর্জন করেন। কিন্তু বিনিময়ে তাকে সম্পদ এবং নিজের বিবেককে হারাতে হয়েছিল।

উপরের ছোট বর্ণনা থেকে ভালোবাসার নিজস্ব চরিত্র সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু পাঠকের কাছে অনুরোধ, আমার লেখা পড়ে ভালোবাসা থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন না। আপনারা ভালোবাসতে পারেন রবার্ট

ব্রাউনিংয়ের কবিতার নায়ক–নায়িকাদের মতো যেখানে আত্মিক ভালোবাসার সঙ্গে পার্থিব ভালোবাসা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এটাই সত্যিকারের ভালোবাসা। ভালোবাসতে পারেন জন ডান–এর স্টাইলে ফর গডস সেক, হোল্ড ইওর টাং অ্যান্ড লেট মি লাভ (For God's sake, hold your tongue and let me love - John Donne, English Poet)। আবার ভালোবাসতে পারেন প্লেটোনিক অথবা ফ্রয়ডিও স্টাইলে। ভালোবাসতে পারেন ভোগবাদী অথবা ভাববাদীদের মতো। তবে সাধু সাবধান আমার মতো ব্রাউনিংয়ের স্টাইলে অর্থাৎ আফটার ম্যারেজ ভালোবাসার সুধা পান করতে গেলে পস্তাতে হবে।

তারা ছিল তিন বোন অনেকটা জেন অস্টিনের প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস–এর নায়িকাদের মতো। সামগ্রিক চাল–চলন ছিল বেনেট ফ্যামিলির মতোই।

আমি শুধু একজনের কথাই বলবো। তার নাম সেনোরিটা। নামটা অবশ্যই ছদ্মনাম। বাবা মায়ের সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে। তার বাবা স্বাধীনতার পর পরই ঢাকায় এসেছিল শূন্য হাতে। বিভিন্ন চড়াই–উৎরাই পার হয়ে অর্থাৎ অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে মাত্র আলোর মুখ দেখছিল। তখনই ঘটলো বিপত্তি। আমার গল্পের নায়িকার বাবা হঠাৎ নিকা করে বসলো তার বড় বোনের বয়সী অর্থাৎ ষোল সতেরো বছরের একটা অভাবী পরিবারের মেয়েকে। শুরু হলো ঘটনার ঘনঘটা। তার মায়ের ওপর শুরু হলো শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন। কারণ স্বাভাবিকভাবেই সে তার অনুজকে মেনে নিতে পারছিল না।

কিছু দিনের মধ্যেই বড় বোন ওয়াকআউট করলো মহল্লার এক বখাটের হাত ধরে। তার অল্প কিছু দিনের মাথায় মায়ের প্ররোচনায় মেজটাও (মাত্র ক্লাস নাইনের ছাত্রী) ইলোপ করেছিল এক টিনএজারের সঙ্গে। এটা নাকি মায়ের প্রতিশোধ ছিল বাবার ওপর। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ আর কি!

এবার সেনোরিটার পালা। সে ছিল অগ্রজদের তুলনায় কয়েক ডিগ্রি বেশি ফ্লার্ট। পরবর্তীকালে জেনেছিলাম সে নাকি আটান্নটি চিঠি রিসিভ করেছিল তার ওয়াটার ক্যান্ডিডেটদের কাছ থেকে। সে অল্প বিস্তর সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সঙ্গে জড়িত ছিল।

আমার সান্নিধ্য তার বাবা–মা সানন্দ চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন যখন শুনেছিল আমি চাকরি নিয়ে লন্ডন চলে যাচ্ছি। কিন্তু বহুবিধ কারণে ভিসা হয়নি বলে তারা গড়িমসি শুরু করলেন।

আমার নায়িকার মনও উড়ু উড়ু করতে লাগলো।

তার বাবা মায়ের ক্যালাস এটিচুড আমাকে আরো আহত করলো।

আজ পবিত্র ভ্যালেনটইনস ডে–তে তার নগ্ন রূপটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। প্রত্যেক বছর ভ্যালেনটাইস ডে–তে তাকে দামি গিফট ক্যান্ডি, কার্ড যাযাদি প্রেজেন্ট করতাম। এখন সেসব শুধুই নষ্টালজিয়া।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি গিয়েছিলাম তাদের বাসায়। কিন্তু সে আমাকে রিফিউজ করলো। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম। প্রচণ্ড আবেগ মুক্তির তাড়নায় তার চুলের মুঠি ধরে একটা গভীর কিস দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ো বেগে বেরিয়ে এলাম।

কিছু দিন পরে জানলাম, সে তার অগ্রজদের অনুসরণ করেছে। গৃহশিক্ষকের প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে ভালোবাসার জয়গান করছে। সেনোরিটার রূপ সৌন্দর্য সম্পর্কে কারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমার কাছে তার সৌন্দর্য শুধুই সাইরেনের মতো অশুভ সুন্দর।

ঢাকা থেকে
kamu_32@yahoo.com

বৌ

- কাজী স্বপন

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে আমার বিরক্ত লাগে। তার মধ্যে পাশের বাড়ির মালতী এসে আরো বিরক্ত করে। মেয়েটা আমার পেছনে লেগে আছে। সব সময় বলতো, আমি আপনার বৌ হবো।

কখনো পাত্তা দিতাম না।

অথচ মেয়েটা এমনভাবে বলতো, শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত সে আমার বৌ হয়ে গেছে। আমার মাকে রান্নাবান্না কাজে সহায়তা করতো। মা কি তার পুত্রবধূ হিসেবে দেখতো কি না কে জানে।

পুত্রবধূ যাতে না করে সে জন্য মাকে আগেই বলে দিলাম, মালতীকে আমি পছন্দ করি না।

কারণ মা যদি একবার বলে মালতীকে বিয়ে করতে হবে। আমাকে তাই করতে হবে। মায়ের অবাধ্য হবো না। আমাদের বাড়ি থেকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে মালতীর বাড়ির সবাই রাজি হবে তা বলতে পারি।

হঠাৎ একদিন মালতীর বিয়ে ঠিক হলো। মালতী আমার কাছে এসে বললো, স্বপনভাই, আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। মনের অজান্তে কষ্ট দিয়ে থাকলে ক্ষমা করে দেবেন। কথাগুলো বলে মালতী খুব কাদতে লাগলো।

মালতীর বিয়ের কথা শুনে আমারও মনটা কেমন জানি হয়ে গেল। হৃদয়ে প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করলাম। আমিও তো ভালোবেসে ফেলেছি। একদিন আগেও বুঝতে পারিনি। মালতীকে এখন কি বলা উচিত ভেবে পাচ্ছি না।

আমার নীরবতা দেখে মালতী বললো, আপনি কি কিছুই বলবেন না?

মালতী চলে যেতে চাইলে আমার মনটা সাহসী হয়ে উঠলো। চট করে মালতীর একটি হাত ধরে বললাম, আমি তোকে ভালোবাসি রে।

মালতী বললো, অনেক দেরি করে বললেন। এই কথাটি শোনার জন্য কতোদিন অপেক্ষা করেছি। আজ আমি খুব খুশি। এখন আমি মরে গেলেও শান্তি পাবো।

কথাগুলো বলে আমার হাতটি ছাড়িয়ে দিয়ে মালতী দ্রুত গতিতে চলে গেল।

যে চলে যাবে। তাকে চলে যেতে দেয়া উচিত। মালতী চলে যাবার পর আমার মনে হলো চারদিকে অন্ধকার দেখছি। কোথাও আমার কেউ নেই।

গায়ে হলুদের দিন আমাকে কয়েকবার খবর দিল যাবার জন্য।

ইচ্ছা করছে যেতে। কিন্তু মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে পারলাম না। চোখের সামনে অন্য মানুষ হলুদ দিয়ে যাবে, আমার সহ্য হবে না। তারচেয়ে ভালো চোখের আড়ালে থাকা।

রাতের বেলায় ঘুম আসছিল না। বারান্দায় পায়চারী করছি আর মনে মনে ভাবছি, সকালবেলা উঠে চার পাচ দিনের জন্য দূরে কোথাও চলে যাবো। হঠাৎ বিয়ে বাড়ি থেকে চিৎকার শুনতে পেলাম।

মা ঘুম থেকে উঠে এসে বললেন, দেখ তো বিয়ে বাড়িতে কি হয়েছে?

মায়ের কথা শুনে বিয়ে বাড়িতে চলে গেলাম। গিয়ে শুনতে পেলাম মালতী বিষ খেয়েছে। আমার অন্তর আত্মা কেপে উঠলো।

তাড়াতাড়ি কয়েকজন মিলে মালতীকে মাইক্রোবাসে করে জয়পাড়া শিউলি ক্লিনিকে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার শাহিন বিষ ওয়াশ করে বললেন, এ যাত্রা বেচে গেছে। আরো কয়েকদিন হাসপাতালে রাখতে হবে।

ডাক্তারের কথা শুনে মনের মধ্যে শান্তি পেলাম। বাকি রাতটুকু মালতীর পাশে বসে রইলাম।

সকালবেলা মালতীর বাবা বললেন, তুমি অনেক করেছো, এখন বাসায় দিয়ে বিশ্রাম নাও।

তিন দিন পর মালতীকে সুস্থ করে বাসায় আনা হলো।

পাত্রপক্ষ এক পর্যায়ে বলে গেল, এ মেয়ের সঙ্গে কিছুতেই বিয়ে করাবে না।

মালতী বিষ খাওয়ার আগে চিঠি লিখেছিল।

আমি স্বপন ভাইকে খুব ছোটকাল থেকে ভালোবাসি। আমার পক্ষে সম্ভব হলো না অন্য কারো সঙ্গে ঘর বাধতে। তাই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলাম।

ইতি

হতভাগী মালতী

চিঠিটা মেয়ের বাবা এনে মাকে দেখালেন।
আমিও এক নজর দেখে নিলাম।
মেয়ের বাবা (লাল মিয়া) আমার মাকে বললেন, এখন আমি কি করবো?
মা বলে দিল, আপনি বাসায় যান, আপনার মেয়েকে পুত্রবধূ করে নেবো।
মেয়ের বাবা এমন কথাই আশা করেছিলেন। শান্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেয়ের বাবা চলে গেলেন।
মা আমার মনের কথাটি বুঝতে পেরেছিলেন।
আমিও তাই চাচ্ছিলাম।
বাসরঘরে মালতী বললো, বলেছিলাম না, আমি তোমার বৌ হবো।
মালতীকে বুকে নিয়ে বললাম, পাগল কোথাকার। এমন কাজ কেউ করে? তুই যদি মরে যেতি, আমার কি হতো একবার ভেবে দেখেছিস?
মালতী আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললো, বাসরঘরে বৌকে তুই করে বলে নাকি?
বললাম, এখন থেকে আর বলবো না। তুমি শুধু আমার।
লাজুক হেসে মালতী বললো, সত্যিকার ভালোবাসা থাকলে মিলন হবেই। তোমাকে ভালোবেসে যেমন দুজন দুজনাকে কাছে পেলাম।
আর কোনো কথা না বলে মালতীর কানের কাছে আস্তে আস্তে বললাম, মন কি যেন চাচ্ছে।
বৌ আমার কানের কাছে আস্তে আস্তে বললো, আজ থাক ...।

আওলিয়াবাদ, ঢাকা থেকে

শত্রু পরিবারের মেয়ে

- মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন বিটু

মানুষ জীবনে অনেক কিছুর স্বপ্ন দেখে। তার মাঝে ভালোবাসাও একটা স্বপ্ন। আর এ ভালোবাসার স্বপ্নটা আমিও দেখেছিলাম। এক সুন্দরী ললনা ফুটন্ত গোলাপ নিয়ে হাজির হয়েছিল আমার এই স্বপ্নময় জীবনে। তাকে আর না করলাম না। আবদ্ধ করলাম ভালোবাসার ডোরে। আমার সেই ভালোবাসার দেবীটি ছিল আমার এক প্রতিবেশী। তাদের সঙ্গে ছিল আমাদের শত্রুতার সম্পর্ক।
কথায় আছে, ভালোবাসা বাধা মানে না। আমার ভালোবাসাও বাধা মানেনি। তার সঙ্গে শুরু হলো ভালোবাসা।
প্রতিদিন একবার হলেও দেখা করতাম। মাঝে মাঝে তাকে চিঠিও দিতাম। তার প্রতি আমি এতো দুর্বল হয়ে পড়ি, তাকে ছাড়া আর যেন কিছুই কল্পনা করতে পারছিলাম না।
বেশি সুখ যেমন কপালে সয়না, আমারও সইলো না। তাকে দেয়া চিঠিগুলোই আমার জীবনের কাল হয়ে দাড়ালো।
আমার দুটো চিঠি দুর্ভাগ্যক্রমে তার বাবা পেয়ে যান। এতে শুরু হলো ভালোবাসায় লঙ্কাকাণ্ড।
ব্যাপারটা আব্বু-আম্মু জেনে গেলেন।
গ্রামের দুজন মাতব্বর নিয়ে তার বাবা বিচার বসালেন।
সবাই চিঠি আর আমার হাতের লেখা মিলিয়ে দেখলেন, মিলে গেল।
দোষ হলো শুধু আমার।

বাবা রাগের ওপর সেদিন আমাকে প্রচুর মেরেছিলেন। নিজেও সেদিন রাগে–দুঃখে, অপমান আর লজ্জায় কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি তা জানিনা।

পরবর্তীকালে নিজেকে আবিষ্কার করি একটি রুমের ভেতর।

কয়েকদিনের মধ্যে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো খবরটি। সবার কাছে ভালো ও মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলাম। কিন্তু একটা মেয়েকে ভালোবাসার জন্য আজ কম বেশি অনেকের কাছেই খারাপ।

শত্রু পরিবারের কাউকে ভালোবাসাই ছিল আমার সেদিনকার বিরাট ভুল। নিজেকে আজও সবার কাছে ছোট মনে হয়।

আমার সে ভালোবাসার দেবীটির বিয়ে হয়ে গেছে। সে এখন অনেক সুখে আছে। অথচ আমি আজও বেচে আছি, সেদিনকার এক নির্মম স্মৃতি বুকে নিয়ে।

একাকী যখন পড়ে থাকি আর নিজেকে একটুর জন্য স্মৃতির ক্যানভাসে ফিরিয়ে নিই, দেখি কখন জানি কষ্টের লোনা জল জমতে থাকে চোখের পাতায়। মনের অজান্তে বলে উঠি –

ভালোবাসা ভালো না

এ হলো এক যন্ত্রণা।

হাতিয়া থেকে

স্বপ্নময়

- আসমানী

এক

জুন ৪, ২০০২ সাল। এই বৃষ্টিস্নাত কাকডাকা ভোরেও একটু পর পর ঘেমে উঠছি। শেষবারের মতো বড় আপাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপা, দেখা করাটা ঠিক হচ্ছে তো!

আপা অভয় দিলেন এতো ভয় পাচ্ছিস কেন, আমি তো আছি।

অনেক খোজাখুজির পর কলাপাতা রঙের সালোয়ার কামিজটা পরলাম। দুই হাতে দুই গাছি লাল রেশমি চুড়ি, কপালে ছোট্ট লাল টিপ, চোখে একটু কাজল। অনেকক্ষণ ধরে আয়না দেখলাম। আমার চেহারাটা বড় বেশি শাদামাটা, মলিন।

রিকশায় উঠে বড় আপা বকতে লাগলেন, তুই আর টাইম পেলি না, ফজরের আজানের পর দেখা করার টাইম দিলি!

আমার কানে কোনো কথা ঢুকছিল না। ভয়ে হিম হয়ে গিয়েছিলাম। বুকের ধুকপুকানি কানে এসে বিধছিল। নিজের অসম্পূর্ণতাগুলো সব এক সঙ্গে মনের পর্দায় ভেসে উঠতে থাকে। এতো সাধারণ একটা মেয়ে আমি। কোনো প্রসাধন, অলংকারই চেহারার জৌলুস ভাবটা এনে দিতে পারে না। কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেলাম না কি মনে করে টিয়া রঙের সালোয়ার কামিজের সঙ্গে লাল চুড়ি পরলাম। আমার তো টিয়া রঙের চুড়ি ছিলই। লাল চুড়ি না হয় পরলাম, টিয়া রঙের টিপ দিতে ভুল হলো কেন? হঠাৎ আমার খুব অস্বস্তি হতে লাগলো।

আমাদের দেখা হলো নির্দিষ্ট জায়গায়। যাওয়ার দশ মিনিট পর তিনি এলেন। আমার লজ্জা লাগছিল।

আপনার জন্য বিস্কিট এনেছি। হাইপ্রোটিন। দুধে গুলে খেতে হয়। দেখবেন সাত দিনেই আপনার শরীর কেমন ভালো হয়ে যায়। এই বোতলে কাসুন্দী। আর এই আমটা কাচা–মিঠা গাছের। কাচা আম খেতে খুব মিষ্টি। কিছু টাটকা শাক সবজিও এনেছি। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বলে এবার একটু থামলাম।

তিনি সব জিনিসপত্র বুঝে নিলেন। কোনো কথা বললেন না।

তার এই নীরবতায় আমার অস্বস্তির মাত্রা বেড়ে দ্বিগুণ হলো। কি করবো কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিয়ে চলে আসি।

বাসায় ফেরার পথে রিকশায় সম্পূর্ণ ঘটনাটা ভাবছিলাম। বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছিল। এমন সময়ে মোবাইলে তার ফোন।

হাসিতে ফেটে পড়ে আমাকে বললেন, আসমানী, তুমি আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করলে না আমি কেমন আছি? পৃথিবীর ইতিহাসে তুমিই বোধহয় প্রথম ব্যক্তি যে প্রথম দেখাতেই ফুড এক্সচেঞ্জ করেছো।

হঠাৎ আমার খুব কান্না পেতে থাকে। আচ্ছা, সারা জীবন আমি কি এমনি সব ভুলই করে যাবো।

দুই

এক আর এক দুই হয় এবং আমরা দুইজন মিলে এক হয়ে গেছি। দুজনেরই এক স্বপ্ন, ঘর বাধবো। পৃথিবীটা আমার কাছে খুব স্বপ্নময়, রঙিন, সৃষ্টির প্রতিটি কণায় ভালোবাসার স্পর্শ অনুভব করি। জীবনের রূপ, রস, গন্ধ যেন পরিপূর্ণভাবে আমার অস্তিত্বে এসে ধরা দেয়।

একেকটা দিন স্বপ্নের মতো কেটে যায়। রাতে জেগে তার কাছে চিঠি লিখি। এ সময়ে কতো অজস্রবার যে চোখ মুছি! মানুষের জীবনটা এতো ক্ষুদ্র কেন? কচুপাতায় এক বিন্দু পানি। তার সঙ্গে আমার এই এক জীবন নয়, আরো চার পাচটা জীবন দরকার ছিল। আমি কাদি। এতো তুচ্ছ, নগণ্য একজন মেয়ে আমি, কোথেকে পেলাম এমন একজন মানুষ, কোথায় রাখবো এতো ভালোবাসা। কাদতে থাকি, কেদে বুক ভাসাই।

তিনি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ববান, শান্ত, নিখাদ ভদ্রলোক। কোনো ব্যাপারেই কোনো তিক্ততা নেই। জীবনের সব কিছু খুব স্বভাবিকভাবেই মেনে নেন। আমার হাজারো ত্রুটি উপেক্ষা করে তিনি আমাকে ভালোবেসে চলেছেন। কারণ তার কাছে আমি সরলতা এবং পবিত্রতার একজন জীবন্ত প্রতিমা।

দেখা হলে হাতে হাত রেখে মুদু একটি কথাই বলেন, আসমানী, তুমি এতো কেদো না। তাহলে আমার আর কোনো কষ্ট থাকবে না।

আমাদের একটি ছোট্ট গাড়ি আছে। প্রতি ছুটির দিনে আমরা পুরো শহরটা কয়েকবার চক্কর দিই। এ সময়ে কেউ–ই খুব একটা কথা বলি না। এ অকারণ নিস্তব্ধতা প্রতিটি মুহূর্তেই জানান দেয় দুজন দুজনের প্রতি প্রচণ্ড বিশ্বস্ততা এবং ভালোবাসার কথা।

মাঝে মধ্যে অফিসের কাজে তাকে দেশের বাইরে যেতে হয়। ফোনের এপাশ থেকে হাউমাউ করে কাদতে থাকি।

আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ফোনের ওপাশ থেকে তার ফোপানির আওয়াজ পাই।

তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

ভ্যালেন্টাইন লজ

– এএন ওয়াহিদ

এর আগে *ভালোবাসা* সংখ্যার লেখায় হ্যাটট্রক করেছি। এবার ছাপা হলে সুপারট্রক হবে। যারা যায়যায়দিন রেগুলারলি পড়েন তারা নিশ্চয়ই আমার লেখা *বর্ষাকাল* পড়েছেন যেখানে প্রায় মৃত্যু থেকে বেচে এসেছি। এছাড়াও আরো কয়েকবার মৃত্যুর হাত থেকে মরতে মরতে বেচে গেছি। তবে আর বেশি দিন হয়তো বা বাচবো না।

বয়স এখন একাত্তর। ভালোবাসার বায়ান্ন বছর আর বিয়ের একান্ন বছর হয়ে গেছে।

আমার স্ত্রী যাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি সে এখন ভালো একটা বাসা চায়, দোতলা বাসা। এক তলায় এখন থাকলেও এখানের পরিবেশ তার ভালো লাগে না। ড্রয়িং কাম বেডরুম তার পছন্দ না। বাথরুম ভালো না। কমোড নেই কেন?

ছেলেমেয়েরা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

কানাডা প্রবাসী ছেলে বলে, তার মাকে একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে রাখতে। কিন্তু সে নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও যাবে না। অগত্য গ্রামের বাড়িতে একটা দোতলা বানানোর প্রোগ্রাম নেয়া হলো।

এর আগে একটা রুম হয়েও গেছে। রুমটা দোতলাই বটে। কারণ নিচে তার একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোর আছে। প্রথম আলোর *বন্ধুসভা*–র সদস্যরা উক্ত ভবনটি উদ্বোধন করে এসেছে গত ১ জুলাই আমার সত্তরতম জন্মদিনে। বিবি সাহেব অসুস্থতার জন্য যেতে পারেনি। পরে সে গিয়েছিল বটে কিন্তু ঘরটি পছন্দ হয়নি।

থাক, সে জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বাড়িটা তৈরি করেছিলাম। তার যত্নের ত্রুটি করছি না। এই তো সেদিন পিকনিকে গিয়ে আনন্দ করে এলাম। প্রত্যেক দিন না হলেও দুদিন পর পর গ্রাম থেকে আরসেনিক মুক্ত টিউবওয়েলের পানি এনে খাওয়াচ্ছি। নিজের বাগানের তাজা শাক–সবজি নিয়ে তাকে দিচ্ছি। যখন যা অর্ডার দিচ্ছে, সুবোধ বালকের মতো তা পালন করে আসছি। এখন তার একটাই বায়না, ঢাকার বাড়ি ভালো করে তৈরি করে দিতে হবে। অনেক ডেভেলপারদের অনুরোধ করেছি।

তারা পুরানো ঢাকায় জয়েন্ট ভেঞ্চারে রাজি নয়।

আমি এই একাত্তরেও ভালো আছি। আমি চাই, আমাদের ভালোবাসার প্লাটিনাম জুবিলিতে আমার প্রিয়তমাকে একটা ভালো ফ্ল্যাট উপহার দিতে।

আমি এখন সব জায়গায়ই *ভ্যালেন্টাইন ওয়াহিদ* নামে পরিচিত। আমার *ভ্যালেন্টাইন কমপ্লেক্স*–এর কাজ শুরু হয়ে গেছে। এতে থাকবে একটা দোকান, একটা নার্সারি ও একটা কিচেন গার্ডেন। ছোট্ট কৃষি ফার্মে থেকে ইতিমধ্যে শাক–সবজি উৎপন্ন হচ্ছে। যারা প্রেম করে বিয়ে করে এখন ঢাকা থাকেন তারা আমাদের *ভ্যালেন্টাইন লজ*–এ বেড়াতে আসতে পারেন। ওখানে গেলে তাজা সবজি পাবেন ও *ভ্যালেন্টাইন মিল* খেতে পারবেন। যাওয়ার আগে ভ্যালেন্টাইন ওয়াহিদ–এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ঢাকা থেকে যেতে প্রায় ঘন্টা খানেক সময় লাগবে। বাই রোডেও যাওয়া যায়, যান্ত্রিক নৌকায়ও যাওয়া যায়। সম্ভবত এ লেখাটি আমার যায়যায়দিনের *ভালোবাসা* সংখ্যায় শেষ লেখা।

ঝিগাতলা, ঢাকা থেকে

নিষিদ্ধ

আমার বাবা ছিলেন একজন সরকারি কর্মকর্তা। দাদা–দাদি বেচে নেই। চাচা–চাচি গ্রামে বসবাস করবেন। আমাদের ফ্যামিলিতে আমি ছাড়া আমার আর কোনো ভাইবোন ছিল না।

চট্টগ্রামে পাচ কাঠা জমিতে একটি বাড়ি। এখানে বেশ কয়েকটি রুম আছে ভাড়া দেয়া। আমরা তৃতীয় নাম্বার ফ্ল্যাটে থাকি। এখানে মায়ের আদর, বাবার স্নেহ, হাসি–খুশি একটি পরিবার। এক কথায় সুখী পরিবার।

আমার মা একটি সন্তান লাভ করতে গিয়ে মারা যান। আমি তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র। আমাদের পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া।

বাবা আর আমি ছাড়া সংসারে কোনো লোক নেই। বাবা থাকেন অফিসে, আমি স্কুলে। এদিকে রান্নাবান্না করার মতো কোনো লোক নেই।

আমরা পড়ে গেলাম এক মহা বিপদে।

একটি কাজের মেয়ে রেখেছিলাম। সে পনেরো দিনের মাথায় মায়ের রেখে যাওয়া শাড়ি, চুড়ি এবং অনেক মালামাল নিয়ে পালিয়ে গেল।

এখন কোনো উপায় না পেয়ে বাবা চিন্তা করলেন গ্রামে গিয়ে একটি কাজের মেয়ে পাওয়া যায় কি না। তাই চাচা বাড়ি গেলেন। সেখানে কোনো লোক পাওয়া গেল না। তাই চাচাদের বাসায় কাজকর্ম করেন আমার এক চাচাতো ফুপু। তার নাম প্রকাশ করবো না। ধরা যাক, নাম বকুল।

তার বয়স ষোল কি সতেরো। তারা গরিব। একবেলা খায় তো দুইবেলা না খেয়ে জীবন ধারণ করে। শ্যামলা বরণ গায়ের রঙ। উচ্চতা প্রায় পাচ ফিট। মোটামুটি ভালো চেহারা।

চাচার কাছে বাবা প্রস্তাব দিলেন, সে আমার বাসায় কাজ করুক এবং আমার ছেলের দেখাশোনা করবে। আমার বিশ্বাস সে পারবে।

এ কথা শুনে চাচা এবং আমার এক চাচাতো দাদি এরা সবাই মিলে বাবাকে ধরে বসলেন, বকুল তো গরিব মানুষ। তার বাবা তাকে কোথায় বিয়ে দেবে মা মারা মেয়েটি। তারচেয়ে বলি, তুই তাকে বিয়ে করে নিয়ে যা।

বাবা প্রথমে রাজি হন না। বলেন, এতে বকুলের কি মত আছে?

আসলে গরিবের মতামত থাকলেও তা প্রকাশ করতে পারে না।

সেই রাতেই কাজি ডেকে বিয়ে করে চট্টগ্রামে বকুলকে নিয়ে আসেন।

শুরু হলো আবার নতুন জীবন। যে ঘর এতো দিন ছিল অন্ধকার তাতে আবার আলো ফুটে উঠলো। ছোটমা আমাকে প্রচণ্ড আদর করেন এবং ভালোবাসেন। একজন সৎমা যে এতো ভালোবাসতে পারে তা মাত্র এই আমি নিজেকে দিয়ে জানলাম।

খুব আনন্দের মধ্য দিয়ে যখন দিনগুলো কাটাচ্ছিলাম ঠিক সেই সময় বিধাতার চোখে আমাদের সেই সুখ সইলো না।

আমি যখন ক্লাস টেনে ঠিক সেই সময় আমার বাবা এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। এ কথা শোনার পরে মনে হয়েছিল সমস্ত আকাশ আমার মাথার ওপর ভেঙে পড়লো।

তারচেয়ে বড় দুঃখ পেল আমার শ্রদ্ধেয় ছোট মা যিনি তার বিয়ের তিন বছর অতিক্রম করতে না করতেই বিধবা হলেন। যে মা পারেননি সেই সময়ের মধ্যে একটি সন্তান জন্ম দিতে। তিনি পেলেন মাত্র বিশ বছর বয়সে তার স্বামী হারানোর যন্ত্রণা।

এরপর নেমে আসে অভাবের ছোয়া। আমি এবং আমার ছোটমা দুজনেই সংসার চালাই। আমার বয়স পনেরো, মা বিশ। বাবা মরে যাওয়ার পরে তার অফিস থেকে কিছু টাকা ও মাসিক রেশন। বাসা ভাড়া যা পাই তাতে দুজনার মোটামুটি ভালোই চলে। তবুও আমার ছোটমায়ের প্রতি মায়া হয়, যে বকুল ছিল গ্রামে সে আমাদের পরিবারে এসে ভালো খাবার-দাবার পেয়ে বকুল ফুলের মতো পাপড়ি মেলে ছিল চার পাশে। সুবাসিত করে তুলেছিল এই অন্ধকার ঘরটি। যার শরীরে ভরা যৌবন সে কেমন করে এতো বড় পথ পাড়ি দেবে!

এভাবে আমাদের সংসার চলতে লাগলো। সারাক্ষণ শুধু চোখের জল ফেলে। আমি মায়ের চোখের জল মুছে দিই।

মা আমাকে বলেন, তুই আমার মনের দুঃখগুলো মুছে দিতে পারবি। না আমাকে ফেলে দূরে চলে যাবি?

না মা, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যাবো না।

এমনি করে কাটে আমাদের মা-ছেলের সংসার।

একদিন রাতে পড়া শেষ করে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ মাঝ রাতে অনুভব করলাম আমার লজ্জাস্থান কে যেন নাড়াচ্ছে। কেমন যেন এক শিহরণ হলো। অদ্ভুত এক অনুভূতি।

আস্তে করে ঘুরে মোচড় দিতেই দেখি অতি প্রিয় মা।

সে আমার রুম থেকে বেরিয়ে তার রুমে চলে গেল।

ভাবতে বিশ্বাস হলো না। ডিম লাইটের আড়ালে দেখেছি সে শুধু ব্লাউজ আর পেটিকোট ছায়া পরা। কিন্তু কি করে সম্ভব! তাই নিজের যখন বিশ্বাস হচ্ছিল না তখন আস্তে আস্তে করে পর্দার আড়াল দিয়ে মায়ের ঘরে চোখ রাখলাম। দেখি মায়ের শরীরে এক বিন্দু কাপড় নেই। কোলবালিশ জড়িয়ে সে হু হু করে কাদছে। চোখে কামনার অশ্রুজল।

আমি এসে শুয়ে পড়লাম। সারা রাত আর ঘুম হলো না। সকালে উঠে বাথরুমে যাবো। বাথরুমে যেতে হলে মায়ের রুম অতিক্রম হয়ে যেতে হয়। তখন দেখি সে নগ্ন ভগ্ন অবস্থায় শুয়ে আছে। দেখে একটি চাদর দিয়ে তার লজ্জাস্থান ঢেকে দিলাম। আমার মনে হয়েছিল মা তা টের পেয়েছে। কিন্তু কিছুই বলেনি। ঘুমের ভান করেছিল।

পরের দিন দুপুরে খাবার খেয়ে ভাবলাম একটু ঘুমাবো।

কিন্তু মা আবার কেন যেন ডাকলেন।

ছুটে গেলাম।

বললো, সামনের দরজা লাগিয়ে এসো তো।

দরজা বন্ধ করে এলাম।

তারপর সে একটি কাপড় পরা ছিল। আমাকে বললে একটু কুচিটা টান দিয়ে ঠিক করে দিতে।

আমি কাপড় টান দিতেই সম্পূর্ণ কাপড় আমার মুখের ওপর। হয়তো এটা ছিল সাজানো নাটক। ভয়ে কেদে ফেলি।

সে আমাকে আদরের ছলে বুকে টেনে নিয়ে এগালে ও গালে চুমু দিয়ে ভরিয়ে দেয়।

আমাকে বলে, তুমি তো এখন অনেক বড় হয়েছো, তুমি কি পারো না আমার জ্বালা মেটাতে?

আমি বলি, সেটা কি জ্বালা মা?

সে এক টানে খাটের ওপরে আমাকে ফেলে দেয় এবং তার সমস্ত কিছু খুলে ফেলে বলে, এবার নিভিয়ে দাও এ জ্বালা। আমি যে আর পারছি না।

এ হয় না মা। এ কি করে সম্ভব!

সে বলে, কেন হয় না?

তার চোখে–মুখে কামনার আগুন।

আমি বলি, তুমি আমার মা।

সে বলে, যদি মা হয়ে থাকি তাহলে আমি বলছি কোনো সমস্যা নেই। এই বলে সে তার নরম ঠোট দিয়ে আমার ঠোট দুটিকে গরম আগুনে পুড়িয়ে দিল।

আমার হাত পাগুলো শুধু কাপছে। তার ভরা যৌবনের সামনে কোনো বাধা–নিষেধ কাজ করছে না।

আমার পরনের লুঙ্গি টান দিয়ে খুলে ফেলেছে।

বাধা দিতে গিয়েও আবার পারছি না।

এরপর যখন দুজনেই ক্লান্ত হয়ে যখন ফিরে এলাম তখন কি যে খারাপ লাগছিল তা বোঝাতে পারবো না। রাতে খেয়ে ঘুমাতে গেলাম। দেখি মা আমার বিছানায়। সে আর তার বিছানায় ঘুমাবে না।

মাকে বললাম, এ হয় না।

তুমি কি তাহলে চাও আমি অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে করে তোমাকে একা করে চলে যাই?

তা আমি চাই না।

তা যদি না চাও, এখন থেকে আমি তোমার কাছ থেকে আমার যৌবন জ্বালা মেটাবো।

আমি জানি আমাদের এই নিষিদ্ধ সম্পর্ক সমাজ কোনোদিনই মেনে নেবে না। কিন্তু আমি এটাও জানি বকুল অসুখী নয়।

আর আমি?

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

স্বপ্নচারিণী

মুন্নী, দূরসম্পর্কের আত্মীয়তার সুবাদে আমার বোন। ও যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে তখন থেকে আমার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা। আমাদের শহরের বাসায় থেকে পড়াশোনা করেছি। মুন্নী ওদের গ্রামের বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়াশোনা করেছে।

আমাদের গ্রামের বাড়ির পাশেই মুন্নীদের বাড়ি। শহর থেকে বেশি দূরে নয়। প্রায়ই গ্রামের বাড়ি যাই। আমি কলেজে পড়ি। স্বভাবতই ক্লাস সেভেনে পড়া মুন্নীর পড়াশোনার খোজখবর নিই। ওদের বাড়িতে আমার অবারিত দ্বার।

মুন্নী এমনিতেই রূপসী। সেই ক্লাস সেভেনে পড়া অবস্থায় ওর বয়স তখন বারো হবে। তখন থেকে ওর শরীরের পরিবর্তনগুলো আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হচ্ছিল। কিন্তু ওর রূপের চেয়ে ওর গুণাবলী আমাকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। ক্লাসের পড়াশোনাতে ও অস্বাভাবিক ভালো। পাঠ্যবইয়ের বাইরেও প্রচুর পড়াশোনা করেছে।

বাইরের বই, পত্রপত্রিকা পড়ার বিষয়ে আমিই ছিলাম ওর গাইড। যখনই শহর থেকে গ্রামের বাড়ি যেতাম যায়যায়দিন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলো এবং শীর্ষেন্দু মুখোপধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, হুমায়ূন আহমেদ এদের বই গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতাম।

মুন্নী গোগ্রাসে এগুলো গিলতো।

মুন্নীর সাথে আমার ভালোবাসার ক্ষেত্রে যায়যায়দিন পত্রিকার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যায়যায়দিন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় আমার জীবনের প্রথম লেখা প্রকাশিত হবার পর পত্রিকা কর্তৃপক্ষ আমাকে অনেকগুলো গৃটিংস কার্ড পাঠিয়েছিলেন। তার থেকে অনেকগুলো কার্ড মুন্নীকে উপহার দিই।

মুন্নী আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে। গ্রামের মেয়ে, এসব সুদৃশ্য কার্ড ও জীবনে দেখেনি। কার্ডগুলো বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে ও ওর বান্ধবীদের উপহার দেয়। এরপর আরেক যন্ত্রণা শুরু হয়।

এরপর থেকে মুন্নী আমাকে তাগাদা দিতে থাকে, আপনি আর কার্ড পান না? পেলে আমাকে দেবেন।

ওকে কি করে বোঝাই যে, এ কার্ডগুলো বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। এরপর থেকে মুন্নীর প্রতি মমতা ও ভালোবাসায় যায়যায়দিন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলোতে লেখা পাঠাতে থাকি। ধন নয়, খ্যাতি নয় লেখা প্রকাশিত হলে শুধু গৃটিংস কার্ড পাবো এই আশায়। আমার বেশ কয়েকটি লেখা যায়যায়দিন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। গৃটিংস কার্ড পেয়েছি মুন্নীকে দিয়েছি। সে যে, কি খুশি হয়েছে! পৃথিবীর অন্য কিছু পেলে যেন এমন খুশি হতো না।

এভাবে মুন্নী কখন যে আমার হৃদয়ের কাছে চলে এসেছে বুঝিনি। *আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি, তবু মনে হয় সে যেন গো কিছু নয়, কেন আরো ভালোবেসে যেতে পারে না হৃদয়।*

দিনের পর দিন চলে গেছে। মুন্নী ক্লাস নাইনে পড়ে। ওর দৈহিক সৌন্দর্য যেনো ফেটে পড়ছে। ওর চোখের দিকে তাকালে রবীন্দ্র সংগীত মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠে *বিধি, ডাগর আখি যবে দিয়েছিল সেকি আমারো পানে ভুলেও পড়িবে না।*

ওর চুলের দিকে তাকালে জীবনানন্দ দাশের কবিতা মনে পড়ে, *চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।* মুখের দিকে তাকালে মনে পড়ে, *মুখ তার শ্রাবন্তীর কারুকার্য।*

ও আমার কাছে এসে দাড়ালে আমি ওর সুস্বাস্থের ঘ্রাণ পাই। না, তখনো পর্যন্ত ওকে আমি স্পর্শ করিনি। দৈহিক কোনো কামনা মনে আসতো না।

ওর সঙ্গে দেখা হলেই ওকে *ছোট্ট পাখি চন্দনা* বলে ডাকতাম।

ও লজ্জায় রাঙা হয়ে যেতো।

প্রেম অনন্ত। প্রত্যেক প্রেমিক মনে করে তার প্রেমিকাকে সে যতো ভালোবাসে, পৃথিবীর অন্য কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকাকে ততোটা ভালোবাসতে পারেনি।

এক সময়ে খুব বেশি ধূমপান করতাম। পরে অবশ্য মুন্নীর অনুরোধে ধূমপান ছেড়েছি। একদিন সিগারেট টানছি। মুন্নী কাছে এসে দাড়ালো। আমাকে বললো, আমাকে একটু সিগারেটে টান দিতে দিন। আমি কৌতূহল বশত ওকে জ্বলন্ত সিগারেটটা দিলাম।

মুন্নী একটুও না কেশে পরবর্তী সিগারেটের অংশটুকু টেনে শেষ করে ফেলেলো।

আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না। মুন্নী বেশ পেকেছে। এর আগেই ও সিগারেটে অভ্যস্ত।

সিগারেট শেষ করে ও ভেতর বাড়ি থেকে পেস্ট ব্রাশ দিয়ে দাত মেজে, মুখ ধুয়ে এলো। আমাকে বললো, *দেখুন তো মুখ দিয়ে আর সিগারেটের গন্ধ আসে কি না*। এই বলে ওর মুখ আমার নাকের কাছে এনে ধরলো। আমার ভেতরে কি যেন একটা ওলোট–পালোট হয়ে গেল। ওকে আমার বুকে টেনে ওর মুখের মধ্যে আমার নাক দিয়ে গন্ধ নিলাম, জিভের এবং কমলা লেবুর কোয়া সদৃশ্য ঠোটে গভীরভাবে চুমু খেলাম। আমার বুকের সঙ্গে ওর বুক লেপ্টে রইলো।

মুন্নী ওর দুইহাত দিয়ে আমার পিঠ বেষ্টন করে রইল অনেকক্ষণ। হঠাৎ আমি সংবিৎ ফিরে পেলাম। ওর এ বয়সে বালিকা সুলভ চপলতায় ও হয়তো আমাকে ওর সব কিছু দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ওকে এভাবে চাইনি। ওর প্রতি আমার ভালোবাসাকে পবিত্র জ্ঞান করেছি। ওর কপালে একটু চুমু খেয়ে ওকে আমার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করলাম।

এভাবে আরো দিন গড়িয়ে গেছে। নিজেকে মুন্নীর উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। নিশ্চিত ছিলাম, মুন্নী সারা জীবনের জন্য আমার হবে। কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা তার ইচ্ছাধীন নয়।

মুন্নীর এসএসসি পরীক্ষার সময়ে ওর পরীক্ষার কেন্দ্র হয়েছিল আমাদের জেলা শহরে। আমাদের বাসায় থেকেই ও পরীক্ষা দিয়েছিল। বেশ বিরতির পর পর এক একটি বিষয়ে পরীক্ষা। মুন্নী আমাদের বাসায় এক মাসের মতো ছিল।

অনেক রাত জেগে মুন্নী পরীক্ষার পড়া তৈরি করেছে।

ওয়াটার হিটার দিয়ে পানি গরম করে ওকে হরলিক্স তৈরি করে খাইয়েছি। আমাদের নিরিবিলি বাসায় আমার মা–বাবা রাতের বেলা ঘুমালেন।

মুন্নীর গ্রামের বাড়ি থেকে মুন্নীর সঙ্গে ওর মা এসেছেন পরীক্ষার কয়েকদিন থাকবেন বলে। তিনিও গভীর রাতে পাশের ঘরে ঘুমালেন।

মুন্নী আলাদা রুমে পড়াশোনা করে।

দূর থেকে ওকে দেখি কাছে যাই না, পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে। আমি তো ওকে গভীরভাবে ভালোবাসি। ওর মঙ্গল চাই। সে জন্য ওর পড়াশোনার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হোক চাই না।

উপরে আল্লাহ সাক্ষী। এক রাতের দুর্ঘটনার জন্য মোটেই দায়ী নই। এক রাতের বেলা। রাত তখন এগারটা। আমি এক গ্লাস হরলিক্স তৈরি করে মুন্নীর কাছে নিয়ে গেলাম। ও গ্লাসের অর্ধেক খেয়ে বাকিটুকু আমাকে জোর করে খাওয়ালো। তারপর বললো, আমার কেমন যেন ভালো লাগছে না। সম্ভবত জ্বর হয়েছে।

আমার কপালে একটু হাত দিয়ে দেখবেন?

পরম মমতায় ওর কপালে হাত দিলাম।

কই, তেমন তো গরম না।

ও আমার হাতখানি নিয়ে ওর গালে ঠেকালো। তারপর ওর গলার নিচে আমার হাতটি রাখলো। এরপর ওর কামিজের উপরের খোলা অংশে আমার হাতটি চেপে ধরলো।

আমি রক্ত মাংসের একজন মানুষমাত্র, ফেরেশতা নই। এ পৃথিবীতে ফেরেশতা বাস করে না। তারা থাকেন ঊর্ধাকাশে। এ পৃথিবীতে কামনা–বাসনায় আসক্ত মানুষ বাস করে। মুন্নীর নীরব আমন্ত্রণ না বোঝার মতো পুরুষ আমি নই। তবু নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। পারিনি।

মুন্নীর হাত দিয়ে চেপে রাখা ওর বুকের পরে আমার হাত ওর জামার উপরের অংশ টেনে নিচে নামিয়ে নেয়। ওর বক্ষ আবরণী নামিয়ে আমার মুখ রাখি পৃথিবীর নিভৃততম স্থানে। আমার ঠোট, আমার দুই হাত ওর সারা শরীর চষে বেড়ায়।

মুন্নী শুধু অস্ফুট একটু বলতে পেরেছে, আমাকে আরো জোরে তোমার সঙ্গে ধরে রাখো।

অবশেষে শান্ত হয় ঝড়।

এই প্রথম, এই শেষ।

তারপর কয়টা দিন বিবেকের তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়ি।

কিন্তু মুন্নী নির্বিকার।

এই লেখাটি এখানে শেষ করতে পারলে খুশি হতাম। আমাকে আর কষ্টের কথা লিখতে হতো না। কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাকে সব কিছু প্রকাশ করতে হবে।

মুন্নী ভালো রেজাল্ট করে এসএসসি পাশ করলো। আমাদের জেলা শহরে এসে সরকারি কলেজে ভর্তি হলো। পড়াশুনার সুবিধার জন্য কলেজের হস্টেলে থাকলো।

আমি হলাম ওর লোকাল গার্ডিয়ান।

ছয় মাসের মধ্যে মুন্নীর আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। সেই গ্রামের সরল, সহজ, অকপট মেয়েটিকে আর ওর মাঝে খুজে পাই না। আমার উপরে আর ওর নির্ভরতা নেই। আমিই ওকে এতোদিন ধরে মনে করতাম সহজ সরল গ্রাম্য বালিকা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুন্নী অনেক আগে থেকে সব বিষয়ে পরিপক্ক হয়েছে। ধীরে ধীরে মুন্নী আমার কাছ থেকে দূরে সরে চলে যাচ্ছিল। ও খুব ফাস্ট জীবন যাপন করছিল।

আমি ওকে বোঝাতাম, কিন্তু ও বিরক্ত হতো।

মুন্নীর একদল নতুন বন্ধু–বান্ধবী হয়েছে সেখানে আমার স্থান কোথায়? আমার সঙ্গে ওর এতোদিনের সম্পর্ক ও তার জীবনে কিছু দিনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করতো।

মুন্নীর সঙ্গে ওর হস্টেলে দেখা করতে যাই। ও মাঝে মধ্যে আমাদের বাসায় আসে।

মুন্নীর মুখে সিগারেটের গন্ধ পাই। আমি ততোদিনে ধুমপান পরিত্যাগ করেছি।

একদিন মুন্নীর হস্টেলে গিয়ে সংবাদ পেলাম মুন্নী তাদের গ্রামের বাড়ি গেছে। পরে সংবাদ নিয়ে জেনেছি, মুন্নী বাড়িতে যায়নি। মুন্নী তখনো আমার আত্মা দখল করে আছে। আমি এ কথা কাউকে জানাইনি মুন্নীর মান–সম্মান ও গোপনীয়তার স্বার্থে এই যে আমি মুন্নীর নাম ব্যবহার করছি। এটাও ছদ্মনাম।

ওকে জিজ্ঞাসা করলে বলেছে, ওর এক বান্ধবীর সঙ্গে তার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল।

আসলে তাও মিথ্যা। তিন দিন তিন রাত মুন্নীর জীবনে ব্ল্যাক আউট। আমার কষ্ট হতো, ভীষণ কষ্ট হতো। আমি চিরদিনের শহরের মানুষ। আমি বুঝতে পারছিলাম মুন্নী দিনের পর দিন এক অন্ধকার জগতের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ও নিজেকে স্মার্ট মনে করতো। পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে মেলামেশাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে করতো। মুন্নীকে দোষ দেবো না। মুন্নী এ সমাজ ব্যবস্থার শিকার। শহরের চাকচিক্যময় জীবনধারায় ও খেই হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু আমি মুন্নীর ওপরে কখনো কোনো জোর করিনি। নিজেকে আস্তে আস্তে মুন্নীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছি।

দীর্ঘ দিন কেটে গেছে। শুনেছি মুন্নী গ্র্যাজুয়েশন করে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করছে। আমি আর যোগাযোগ করতে চেষ্টা করিনি।

মুন্নী, আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, আমাকে ক্ষমা করে দিও। কিন্তু নিজের বুকে হাত দিয়ে বলো, কে অপরাধী!

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ক্ষমা প্রার্থী

- মনিরুল হক বাবু

লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট – প্রথম দেখাতেই প্রেম।

তোমাকে দেখে আমারও তাই-ই হয়েছিল। সবে মাত্র দু সপ্তাহ হলো এই হস্টেলে এসেছি। হস্টেলটা রেসিডেনশিয়াল এরিয়াতে।

সমাজতন্ত্র পতনের কারণে আমাদের এই দেশে আসাটা বেশ সহজ হয়ে গেছে। আমরা বাঙালি ছাত্ররা (তোমার পিতার মতে হিন্দু) গ্রীষ্মের বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলতাম হস্টেলের নিচে। আর দূর থেকে অপার বিস্ময়ে তোমরা তাকিয়ে থাকতে। নেকড়ের মতো এক পা এগোতে তো দু-পা পিছুতে। তোমাদের মধ্যে ছিল অজানাকে জানার আগ্রহ, আমাদেরও তাই।

এক, দুই, তিন দিন অবশেষে আনিয়ার মায়ের হস্তক্ষেপে ভাঙলো তোমাদের জড়তা। এলাম আমরা কাছাকাছি, হলাম ঘনিষ্ঠ। আনিয়া, জয়, জয়া, টুকু, লিয়ানা, মিজান।

আমার রুমমেট ইসমত-এর ভাবমূর্তি হলো কমন আংকলের মতো। আর আমি পড়ে আছি তোমার পেছনে। ভাবখানা এমন করে রেখেছো যেন কোনো পাত্তাই দেবে না। কারণ আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। জানলে আমি মুসলমান পক্ষান্তরে তুমি ইহুদি। *সাপে আর নেউলের মধ্যে প্রেম*।

তোমার কালো হরিণী চোখ, সুদীর্ঘ কালো-লম্বা চুল, একহারা গড়ন, মাথা উচু করে হেটে চলা সর্বোপরি তোমার মুক্তা ঝরানো হাসি আমার সব ওলোট-পালোট করে দিয়েছে। আমার অক্লান্ত প্রচেষ্টার জিত হলো, ভাঙলো তোমার প্রতিরোধের দেয়াল।

অবশেষে অস্তগামী স্বর্ণালী সূর্যের লুকোচুরি আলোতে মিলিত হলো দুটি ঠোটের। তোমার ভয় পাছে, তোমার ভাই দেখে ফেলে! বাস্তবিকই আমাদের মিলনের আধা মিনিট পরই সে উপস্থিত হয় আমাদের মাঝে। সত্যি তোমার ইএসপি পাওয়ার অবাক করার মতো যার প্রমাণ তুমি আরো একবার দিয়েছিলে।

তোমার ভাই চলে যাওয়ার পর শুরু করলে বাধনহীন রোদন। আমি তো অবাক, প্রশ্নের প্রতিউত্তরে বললে, এটা সুখের এবং আনন্দের রোদন। সেই মুহূর্তে নিজেকে রোমিও-র চেয়েও বড় প্রেমিক মনে হলো।

বর্তমানে এই ঐতিহাসিক প্রেমিকের ডেটিং স্থলের খুবই কাছে আমার আবাসস্থল।

জানতাম ধর্মীয় বিরোধ শুধু মুসলমান আর ইহুদির মধ্যে। কিন্তু আমার ভুল ভাঙলো যখন আনিয়া, জয়-রা তোমার পেছনে তোমার ধর্মীয় বিশ্বাসকে কটাক্ষ করতো।

এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্ত করলেন তোমার পিতা। আমাদের জন্য করে দিলেন আলাদা রুমের ব্যবস্থা। আমরা যেখানে আমাদের নিবিড় সময়টুকু কাটাতাম।

সম্পর্কের উন্নতি হলো তোমার পরিবারের বাকি সদস্যের সাথে। নববর্ষের রাত একত্রে উৎযাপন করলাম। স্বপ্নের মতো পার হলো একটি বছর। এরপর হঠাৎ করে শোনালে দুঃসংবাদ যে, তোমার ফুল ফ্যামিলি খুব শিগগির ইসরেলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করবে। তুমি, তোমার মা বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন তোমাদেরকে দেখার জন্য ইসরেল-এ আসতে। কিন্তু তোমরা জান না যে, আমার পাসপোর্টে লেখা *All*

countries of the world except Israel. কিন্তু এই জন্য আমার সরকারকে দোষ দিচ্ছি না। এ বিষয়ে সরকারের নীতি সঠিক। তবে আমাদের আবারও দেখা হবে আশি বছর পর হলেও।

তুমি চলে যাওয়ার পরের দিন এসেছিলাম তোমার বাড়ির সামনে। প্রতিবেশীরা বললো, তোমার বাধভাঙা কান্নার কথা। ইচ্ছে পোষণ করেছিলে একটিবার বাবুকে দেখার। ধর্মীয় বাধা, মা–বাবার কঠোর শাসন, আর বড় ভাই এলেক্স-এর চোখ রাঙানিকে উপক্ষো করে এই বাঙালি বাবুকে ভালোবেসে যে সম্মানে সম্পর্ক নত করলে তার প্রতিদান সেদিনের সেই শেষ বিকেলে দিতে পারিনি। লজ্জিত আমি, আমাতে আমি ভীষণ লজ্জিত।

অভিমানে ক্ষোভ আর হারানোর বেদনা তাৎক্ষণিকভাবে সহ্য করতে পারবো না ভেবে আমার এই পশ্চাদপসরণ। কিন্তু আজ সুদীর্ঘ পাচ বছর যাবৎ উপলব্ধি করতে পারছি যে, সিদ্ধান্তটা ছিল চরম ভুল। সর্বোপরি উপলব্ধি করতে পারছি, কি এক সীমাহীন ব্যথা আর মিথ্যে সন্দেহ বুকে নিয়ে চলে গেলে।

আজ ভ্যালেনটাইনস ডে। ক্ষমা চাচ্ছি আমার কাপুরুষোচিত আচরণের জন্য। সে জন্যই এ চিঠি। যদিও আমার মাতৃভাষা আর তোমার মাতৃভাষার মধ্যে নেই কোনো মিল। এবং পড়বে না কোনোদিন তোমার চোখ আমার এই চিঠির ওপর। তবুও বিশ্বাস করি তোমার ইএসপি–র ওপর। বুঝতেই পারছো, তুমি আছো আমাতে মিশে, থাকবে আজীবন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তোমার নামে আমার সন্তানের নামকরণ করেছি। তাই এই লেখাতে তোমার নাম উহ্য।

ভিসেনজা, ইটালি থেকে

লিউক ডিমার্শ

- আবিদ করিম মুন্না

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহের অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি বিভাগে মাস্টার্স কোর্সে গবেষণার কাজ করছিলাম ঔষধি উদ্ভিদের ওপর *আরডিআরএস* (রংপুর দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস) *বাংলাদেশ*–এর ফেলোশিপ এবং *জিটিজেড* (জার্মান টেকনিকাল কো–অপারেশন)–এর অর্থায়নে লালমনিরহাটের দুটো উপজেলায়। হঠাৎ করেই মেসেজ পেলাম জিটিজেড–এর টিম লিডার জার্মান নাগরিক লুইস ওয়ার্ল্ডমুলার–এর : *প্লিজ সি মি ইমিডিয়েটলি*।

ছুটে গেলাম রংপুর শহরের লালকুঠি মোড়স্থ জিটিজেড অফিসে। মি. লুইস জানালেন, সুদূর কানাডা থেকে বাংলাদেশস্থ কানাডিয়ান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (ডেভলপমেন্ট) মরি মাইলফ–এর এক ভাতিজা বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের কবিরাজদের ব্যবহৃত ঔষধি গাছগাছালির ওপর প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ এবং পরবর্তীকালে গবেষণার জন্য এখন ঢাকায় অবস্থান করছে। তোমার কোনো আপত্তি না থাকলে ওকে কিছু দিন সঙ্গ দাও তোমার গবেষণা কাজের পাশাপাশি।

সানন্দ চিত্তে সম্মতি প্রকাশ করলাম। কিছুক্ষণ পর ফোনে কথা হলো সেই তরুণের সঙ্গে এবং জানতে পেলাম বাইশ বছর বয়সী সেই তরুণের নাম লিউক ডিমার্শ।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, রবিবার আমাদের প্রথম দেখা হলো জিটিজেড অফিসে। কিছু সময়ের মধ্যেই তার লাগেজ নিয়ে রওনা দিলাম লালমনিরহাটের উদ্দেশ্যে বাস ধরার জন্য রংপুরের প্রাচীন শহর মাহিগঞ্জের সাতমাথা মোড়ে। শহরের হই চই আর শব্দ দূষণ থেকে বাচতে আমরা রিকশা নিয়ে কোলাহলমুক্ত এলাকা হয়েই সাতমাথা পৌছেছিলাম সেদিন।

একটি ভ্রমণের জন্য যা সঙ্গে থাকা প্রয়োজন – ক্যামেরা, ওয়াকম্যান, বাইনোকুলার, ওয়াটার ক্যান, ফিল্ড গাইড, এশিয়া মহাদেশের সব প্রজাতির পাখির ছবিযুক্ত বইসহ প্রায় সব কিছুই ছিল লিউক–এর সঙ্গে।

এক সময় বাসে চেপে বসলাম। আমি জানালার দিকে আর সে করিডোরের দিকে। বাংলাদেশে বাসে কিংবা ট্রেনে আসনের চেয়ে অধিক যাত্রী তোলার গল্প সে আগে থেকেই জেনেছিল। কিন্তু আমাকে অবাক করেছিল, এক বৃদ্ধ আচমকা উঠে দাড়িয়ে বাসের হ্যান্ডল ধরে যেতে থাকলে লিউক তার নিজের আসন ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধকে বসতে দিয়েছিল। এই ভালোবাসাটা আমাদের সবার জন্য একটা শিক্ষাও ছিল সেদিন। সত্যিকারের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এটাই তো প্রকৃত নমুনা।

লালমনিরহাটে আরডিআরএস–এর গেস্টরুমে ছিল লিউক। আমি থাকতাম আরো প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে আদিতমারী উপজেলায়। প্রতিদিন সকালে বগুড়ার বাসে অথবা লোকাল ট্রেনে চেপে লালমনিরহাটে আসতাম লিউকের কাছে। দেখতাম একটা মাটির পাত্রে ঈগল পাখির পাখা পুড়িয়ে নস্যির মতো নাকে টানা। এটি নাকি কানাডিয়ান পচাশি বছর বয়স্ক তার পরিচিত এক কবিরাজ ব্যবহার করতে বলেছে। এ কাজটি করলে নাকি বেশ কিছু রোগের হাত থেকে বাচা যায়।

তখন ছিল বসন্তকাল। শীত শীত ভাব বেশ ছিল। ঋতুরাজ বসন্তের প্রতীক্ষায় ছিলাম বহুদিন। বেশ কয়েক বছর ধরে পরিকল্পনা ছিল গ্রামে গিয়ে বসন্তের ফোটা পলাশ–শিমুল–পারিজাত ফুলের ছবি তুলবো। লিউকের ছিল হাই কোয়ালিটির পাওয়ারফুল লেন্স ক্যামেরা আর আমার কেনা ছিল ফিল্ম। সে অবশ্য কানাডা থেকেও উন্নতমানের ফিল্ম এনেছিল।

প্রথম ফিল্ম ব্যবহার করে বসন্তের ফোটা ফুলগুলো ছাড়াও পাখি ও প্রকৃতির অনেক ছবি তুললাম। এ সুযোগে শিখেও ফেললাম ক্যামেরা চালানো। এবং চেষ্টা করলাম বাংলাদেশকে ভালোবাসাতে। আমরা লালমনিরহাট এবং আদিতমারীতে প্রায় দশটি ফিল্ম ছবি তুলেছিলাম।

কানাডা যাবার আগে সেসব ছবি এক কপি করে এবং সব নেগেটিভ ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ আমাকে উপহার দিয়ে গিয়েছিল।

লিউকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিই কবিরাজ মর্জিনা বেগমের সঙ্গে। দুই দিন গিয়েছিলাম সেই বাড়িতে। দ্বিতীয় দিন এক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেললো। বিদেশিরা কোনো কিছু বুঝলে *ইয়েস* অথবা *হ্যা* শব্দটি উচ্চারিত করে। এক সময় লিউক–কে বললাম, তুমি আমার এবং কবিরাজের আলাপচারিতার একটি ছবি ক্যামেরাবন্দী করবে। তবে পজিশন নেবে বাড়ির বাইরে।

পজিশন নেয়ার জন্য আস্তে আস্তে *হ্যা হ্যা* শব্দ করে এগিয়ে যেতে থাকলে পাশের বাড়ির একটি কুকুরও পিছু পিছু যাচ্ছিল। কুকুর হয়তো ভেবেছিল লিউক তাকে ডাকছে আদর করে। ভাগ্যিস, আমরা টের পেয়েছিলাম। তা না হলে ছোটখাটো একটা বিপদ ঘটেও যেতে পারতো।

আমরা দুপুর তিনটার মধ্যে কাজ শেষ করে লাঞ্চের জন্য লালমনিরহাট শহরে চলে আসতাম। তারপর ছবি পৃন্ট করতে যেতাম লালমনিরহাট স্টেশনের ওভারবৃজ পার হয়ে। ওভারবৃজ পার হবার সময়কার একটি ঘটনা আজো মনে পড়ে। সেটি হলো, একজন সাইকেল আরোহীর সাইকেল তুলে দিতে সাহায্য করা।

চলতি পথে অনেকেই আমাদের পথ রোধ করতো। জানতে চাইতে লিউক সম্পর্কে অনেক কিছু তারই মুখ থেকে। বাধ্য হয়েছি তাকে বাংলা শেখাতে এবং প্রবল উৎসাহ দেখেছি আমাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি। সে পরিষ্কার বাংলায় বলার চেষ্টা করতো। আমার নাম লিউক, লিউক ডিমার্শ, আমি কানাডা থেকে *এইচেচি* (এসেছি), আমি বাইশ, আমি অবিবাবিতো (অবিবাহিত), আমি বালোবাসি (ভালোবাসি) ফান (পান) এবং *থুপারি* (সুপারি), *খাইতে* (খেতে)।

এই পান সুপারি খাওয়ানোর অভ্যাসটা করিয়েছিলেন রংপুরের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক *যুগের আলো*–র তৎকালীন বার্তা সম্পাদক আফতাব হোসেনভাই। রংপুরের পত্রিকাগুলোতে তাকে নিয়ে বেশ ভালো একটা কভারেজও করেছিল সে সময়।

শুক্রবারটা আমরা কাটাতাম রংপুর শহরে। রংপুরের যে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে সে মিশেছে, বিশেষ করে সাংবাদিক নজরুল মৃধার বাড়িতে যৌথ পরিবারের একত্রে বাস তাকে মুগ্ধ করেছিল। সে বাড়িতে নারিকেল, চালতাসহ বিভিন্ন পদের পিঠা আর পায়েশ তৃপ্তির স্বাদের কথা সে ভুলতে পারেনি যাবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত। কথায় কথায় জেনেছিলাম তাদের দেশে যৌথ পরিবার অকল্পনীয়।

লিউক–রা থাকতো পুর্ব কানাডায়। সে জানিয়েছিল, তারা নাকি ওই দেশের সবচেয়ে গরিব মানুষ। লিউক সঙ্গে এনেছিল প্রায় আধ লাখ টাকা। আমাকেই বিশ্বাস করে সে তার সমস্ত টাকা রাখার জায়গা দেখিয়েছিল। সে টাকা রাখতো বিশেষ ধরনের তৈরি কোমরের বেল্টের চেইনের ভেতরে।

লালমনিরহাটে আরডিআরএস গেস্ট হাউস থেকে তাকে ফিরে আসতে হলো ঈশ্বরের মণ্ডলী গির্জার রেস্ট হাউজে। সে সময় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন *লালমনি এক্সপ্রেস* উদ্বোধনের জন্য আসবেন। এ কারণে ভিআইপি গেস্ট আসবে বলে তার রাত যাপন স্থান পরিবর্তন করতে হয়।

সকালে সে সাধারণ ফলমূল খেতো। ডাস্টবিনের অভাবে সে সারা রাতের জমানো আবর্জনা সে ফেলতে পারেনি। পরদিন সকালে ডাস্টবিন খুজে পাবার পর সে ফেলেছিল। সব কিছুতেই তার মধ্যে দেখেছি অন্য রকম এক মানুষের ছাপ।

একদিন সে মাথাব্যথা ও হালকা জ্বরে আক্রান্ত হলো। তাকে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাবার পরামর্শ দিলাম।

কিন্তু সে ভেষজ উদ্ভিদ ছাড়া কিছুই স্পর্শ করবে না।

পরদিন তাকে নিয়ে গেলাম কবিরাজ নূর মোহাম্মদের বাসায়।

কবিরাজ সাহেব কচি করল্লার পাতা দিয়ে কি যেন একটা বানিয়ে দিলেন।

সেবনের আধ ঘন্টা পর জানালো *অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যাই আম নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ওকে*।

ঠাণ্ডায় রিকশা যেতে যেতে ভীষণ কাপছিলাম। এ অবস্থা দেখে তার নীল রঙের সোয়েটার আমাকে পরতে দিয়েছিল। সে জানিয়েছিল, কানাডায় মাইনাস এগারো ডিগ্রিতে থেকে তাদের অভ্যাস আছে।

আদিবাসীদের জনপ্রিয় একটি গান *এ ওয়ে আ হে আ, এ ওয়ে আ হে আ হে ... কুদিন* ও। গানটি মাঝে মধ্যে গুন গুন করে আজো গেয়ে যাই অবিরাম। গানটির অর্থ ভুলে গেছি। তবে পাহাড়ি এক বালিকার প্রেমে পড়া নিয়ে কি যেন বলেছিল।

সে বাংলাদেশের একটি গান শিখতে চেয়েছিল। *দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা বন্ধু চিরকাল, রেল লাইন বহে সমান্তরাল* গানটি ভাঙা ভাঙা বাংলায় ভালোই গেয়েছিল। সব সময় দেখেছি বাংলা শেখার প্রতি তীব্র একটা আকাঙ্ক্ষা। একটা ডায়রিতে কি সব ইংরেজি উচ্চারণে লিখে যতো বিরামহীন।

৬ মার্চ ২০০৪–এ ঢাকায় ফিরে যায় তার গবেষণার জন্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ করে। বাংলাদেশে আমার সঙ্গে কাটানো সময়গুলোতে চেষ্টা করেছি এ দেশটাকে ভালোবাসাতে, ভালো লাগাতে। একজন ভিন দেশি তরুণকে যতোটা সময় কাছাকাছি পেয়েছিলাম, প্রতি মুহূর্তেই নতুন কিছু শিখেছি।

কানাডাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাকে ভবিষ্যতে সাহায্য করবে বলে আশ্বস্ত করে। মাঝে মধ্যে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি ই–মেইলে।

সেন্ট্রাল রোড, রংপুর থেকে

akmunna23@yahoo.com

পলাতক

এ পৃথিবীতে কতো বিচিত্র মানুষই না জন্মগ্রহণ করে। আমিও তাদের দলেরই একজন। পাড়াগায়ে জন্ম এবং বাবা মায়ের অজ্ঞতার কারণে স্কুলের গণ্ডিতে পৌছাতে একটু দেরি–ই হয়। যখন প্রাইমারি স্কুলে পা রাখি তখন পৃথিবী সম্পর্কে আমি ভালোই অবগত।

যখন আমি ক্লাস ফাইভের ছাত্র তখনই নিজের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করি প্রকৃতির নিয়মেই। অপরের প্রতি আকর্ষণ। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ যতোটা ক্ষীণ, সমলিঙ্গের প্রতি ততোটাই প্রবল। তাই আমার ভালো লাগা এবং ভালোবাসার আকর্ষণ জন্ম নেয় সমলিঙ্গের প্রতি।

দুর্বার আকর্ষণে ছুটে যেতাম চল্লিশউর্ধ একজন কৃতদারের কাছে। সেও আমার দলেরই একজন, পরে বুঝতে পেরেছি। আমার বিশেষ অঙ্গ নিয়ে সে বেশ নাড়াচাড়া করতো। কোনো এক সময় সকল বাধা ছিন্ন করে তার সঙ্গে প্রথম ....।

খুব শিহরিত হলাম। ভালো লাগার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকলো।

কোনো এক সময় এর ছেদ পড়লো।

এরপর আমি হাই স্কুলের ছাত্র। ছাত্র হিসেবে এলাকায় যথেষ্ট সুনাম আছে। তারপরও ওই যে সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ! অন্য দশজনের চেয়ে একজন সুদর্শন বন্ধুর প্রতি আকর্ষণ তীব্র। ইচ্ছে হতো তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে। কিন্তু সামাজিক কারণে পুরুষের লেবাস থাকলেও ভেতরে ভেতরে কষ্ট অনুভব করতাম।

সকল দুঃখ কষ্ট সয়ে এখন আমি ত্রিশউর্ধ। শম্বুক গতিতে চলছে জীবন। কারণে–অকারণে নষ্ট করছি নিজেকে। পশ্চিমি বিশ্বে আমার জীবনের সার্থকতা থাকতো। এখন আমার জীবন–মৃত্যুর দোলায় চলে। পরিবার থেকে বিয়ের চাপ দিচ্ছে। নিজেকে আর কতো লুকিয়ে রাখা যায়! পালিয়ে বেড়াচ্ছি জীবন থেকে।

সবচেয়ে করুণ সত্য যেটা, এখন আর বাচাতে ইচ্ছে করে না। আমার ভালো লাগা এবং ভালোবাসা আমার অন্তরের গোপন দলিল। এ যে সইবার নয়!

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রতারক

আজ হোচট খেতে খেতে নিজে এতো বেশি ক্লান্ত হয়ে গেছি যে, নিজের কাছে নিজেকে খুব বেশি অসহায় লাগে। স্বামীর কর্মক্ষেত্র চট্টগ্রাম ওর ডাকেই চলে এলাম। দুই বাচ্চার মা আমি। কোনো রকম সাতপাচ করে রাতকে দিন, দিনকে রাত বলে কাটাচ্ছি।

চট্টগ্রাম আসার দুই তিন মাস পর অসুস্থ শরীর নিয়ে একটা ফোনের দোকানে গেলাম খুব দরকারি একটা ফোন করতে। দোকানে গিয়ে সেদিন মালিক রূপে যাকে দেখলাম, একবার দেখাতেই কেন জানি লোকটাকে এতো বেশি চেনা চেনা এবং খুব আপনার বলে মনে হলো।

ফোনে কথা বলে চলেও এলাম।

এরপর লোকটার সাথে কথাও হলো, সম্পর্ক খুবই গভীর হলো। আমার প্রতিটি বিপদে সবার আগে তিনি চলে আসেন।

এক বছর খুবই আনন্দের মাঝে কাটলো।

তিনি প্রতিদিন আমার বাসায় আসতেন। একদিন যদি কোনোভাবে না আসতেন, পরে এসে ক্ষমা চাইতেন। এভাবে ক্রমেই ওর ব্যবহারে বুঝলাম যে, ও আমাকে চায়। শত বাধা অতিক্রম করে ওর ডাকে সাড়া দিতাম খোদা একজন আছেন জেনেও।

ও খুব খোদাভীরু ছিল। কিন্তু নারী লোভী ছিল। ভালোবেসে ফেলে পরে বুঝেছিলাম ও ঠকবাজ বদমায়েশ। মোবাইলের দোকান ছিল বলে প্রায় পঞ্চাশটা নারীর সাথে ওর ফোনে পরিচয় ও গভীরতা। তবুও নিজের সংসারের দিকে তাকিয়ে ওর এই প্রতারণা মেনে নিই।

ধীরে ধীরে নিজেই সরে যেতে লাগলাম অনেক কান কথা শুনে। পরে নিজের চোখে দেখার পর ওর সত্য ঘটনা জেনে যাই।

একটা বেশ্যার প্রতি ওর আগ্রহ ছিল। খোদা, তুমি ওর বিচার নিজ হাতে করো। আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে ও সোনার সংসার ভাঙার প্ল্যান করেছিল। পাপ জেনেও ওকে সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছিলাম।

কিছু নেবো না এ কথা ও কোনো দিন বলেনি। রাক্ষসের মতো সবই নিয়েছে।

তবুও কেন জানিনা খুব বেশি ওকে মনে পড়ে। হে খোদা, ও তো আজ সব কিছু ভুলে অন্যকে নিয়ে সুখে আছে।

স্বামীর সঙ্গে বাস করেও হাজার বার ওর কথা মনে হয়। মনকে বুঝিয়ে ওর মতো বশে আনতে পারছি না। তাই বলবো, চোখে যে আগুন দেখা যায়, সে আগুন নানান কায়দায় নেভানো যায় আর যে আগুন কাউকে না পাওয়ার বেদনায় নীরবে নির্জনে কাদায় সে আগুন কি দিয়ে নেভানো যায়।

তাই আজও শত কষ্টের মাঝেও বলবো :

ইচ্ছে করে তোমার দুচোখ আজ আমাকে এড়ায়
আমাকে আজ ভুলতে গিয়ে হাটো অন্য পাড়ায়।
ভালো থেকো আজকাল এবং প্রতিদিন এই প্রত্যাশায়।

তোমার ডাকা সেই **ভাবী**
চট্টগ্রাম থেকে

ময়নার মা

- পচার বাপ

আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম। সেটা আজ নয়, সেই কলেজ জীবনের প্রথম থেকে। সে তখন আমাকে মোটেও সেভাবে ভাবতো না। কেননা সে তখন অন্য কাউকে ভালোবাসতো যা আমার অজানা ছিল। কিন্তু সে আমার ভালো বন্ধু ছিল। বন্ধুত্বের সূত্র ধরেই এগোচ্ছিলাম আমি।

আমার ভালোবাসা অব্যক্তই থাকতো যদি না বদলি হয়ে ঢাকা পলিটেকনিকে চলে আসতাম। এখানে আসার পর থেকে আমাদের ভালোবাসার সূত্রপাত, সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাধ সেধে বসে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়ন। সেও তাকে পছন্দ করতো যা আমি জানতাম না।

আমি দূরে চলে আসাতে সে (নয়ন) সুযোগ পেয়ে যায়। দীর্ঘ দিন ধরে সে গুটিগুটি পায়ে এগোতে থাকে।

এভাবেই চলতে থাকে আমাদের সম্পর্ক। আমার সঙ্গে শুধু চিঠিতে যোগাযোগ এবং নয়নের সঙ্গেই সর্বদা চলাফেরা। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমনই হয় যে, আমিই হয়ে যাই তৃতীয় পক্ষ।

এর মধ্যে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে জানায় তার মনের কথা এবং রীতিমতো আমাকে তার পথ থেকে সরে যেতে বলে। ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে সে ফাইনাল পরীক্ষা দেয়। আমি তখন ঢাকায়।

ঈদের বন্ধে বাড়ি গিয়ে শুনি তার মেজ দুলাভাই তার এক বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছেন এবং সে পাত্রী দেখতেও এসেছিল। তবে তার আর বিয়ে করা হলো না।

আমরাই সিদ্ধান্ত নিলাম কোর্ট ম্যারেজ করবো। যেহেতু দুজনই সাবালক–সাবালিকা, তাই কোনো সমস্যা ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে আমরা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হই। পরবর্তী কালে বাসায় জানিয়ে দেই। বাকিটুকু কি সমস্যা হয়েছিল, লেখার দরকার নেই, বুঝতেই পারছেন।

ভিলেইন হয়ে দাড়ান আমার আম্মা, ওর আব্বা এবং আমাদের সেই বন্ধু। সকলে মিলে চেষ্টা চালায় কিভাবে ডিভোর্স দেয়া যায়। কেউ এ বিয়ে মেনে নেয় না, বরং ডিভোর্সই তাদের কাছে একমাত্র সমাধান বলে মনে হয়। অনেক গোপনীয়তা রক্ষা করার পরেও নয়ন আমাদের বাসায় জানিয়ে দেয় যে, আমরা কবে, কোথায় বিয়ে করেছি এবং বর্তমানে আমাদের রেজিস্ট্রি কপি ও কাবিননামা কোথায় আছে যাতে করে ডিভোর্স দেয়ানো সহজ হয়।

আসলে সে চেয়েছিল আমাদর ডিভোর্স হোক। সে এটা চিন্তা করেনি যে, ডিভোর্স হলেও ওই মেয়েকে সে কোনোদিনই পাবে না।

শেষ পর্যন্ত অনেক যুক্তি–তর্ক, চড়াই–উতরাই করে সকলে আমাদর বিয়েকে মেনে নিয়েছে। আজও আমরা সংসার পাততে পারিনি। সেও এখনো বাবার বাসায় থেকে পড়াশোনা করে এবং আমি এখনো ঢাকায় বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি। লেখাপড়া শেষ করে তবেই সংসার পাতবো।

একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি। বর্তমানে আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলের নাম পচা আর মেয়ের নাম ময়না (ছদ্ম নাম)। মেয়ের বয়স দুই বছর। ছেলেটার বয়স দুই মাস।

এই ভালোবাসা দিবসে আমার স্ত্রী অর্থাৎ আমার ময়নার মাকে (আমার দেয়া নাম) জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন এবং উজাড় করা ভালোবাসা। তাকে কতোটা ভালোবাসতে ইচ্ছে করে যে, যেন উপভোগ করেও শেষ করতে না পারে। এ ফেব্রুয়ারিতেই পূর্ণ হবে আমার ভালোবাসার সপ্তম বছর এবং আমার বিবাহিত জীবনের চতুর্থ বছর। এভাবেই চলছে আমার ও দুই সন্তানসহ ময়নার মায়ের জীবন।

ঢাকা থেকে

টিপস

– রিমি

মানুষের কাছে জনপ্রিয় হবার মতো কয়েকটি টিপস উপস্থাপন করা হলো। আসুন, এই ভালোবাসা দিবস থেকেই জাগ্রত চোখে অনুশীলন করুন না, দোষ কোথায়? একদিন দেখবেন নিজের অজান্তেই অপরের কাছে আপনার প্রশংসার ফুলঝুরি। তখন চমকে যাবেন নিজেই। তাহলে চলুন জেনে নেই টিপসগুলো :

নাম মনে রাখুন : পথে–ঘাটে চলার পথে যেখানেই হোক না কেন কারো সঙ্গে দেখা হওয়া, মাত্র প্রথমেই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তার পরিচয়টা জেনে ফেলুন। হৃদয়ের গভীরে তার নামটা এটে নিন। পরবর্তী কালে দেখা হলে হাসিমুখে তার নাম ধরে সম্বোধন করুন, দেখবেন ধীরে ধীরে সে আপনার প্রতি দুর্বল হচ্ছে।

হ্যান্ডশেক করুন : কারো সঙ্গে সাক্ষাতের শুরুতেই আন্তরিকতার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিন। আপনার হৃদয়ের কোমলতা হাতের মাধ্যমে পৌছে দিন তার মননে। দেখবেন সে আপনার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে উঠছে।

অভিবাদন জানান : পরিচিত–অপরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলেই সালাম দিন। হাই, হ্যালো, গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন ইত্যাদি বলে তাকে অভিবাদন জানান। বিদায়ের মুহূর্তে গুডবাই, আবার দেখা হবে, সালাম, আল্লাহ হাফেজ, রাত হলে গুড নাইট বলে বিদায় নিন।

মুচকি হাসুন : কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আপনার চোখে-মুখে গুরু গাম্ভীর্যতা না ফুটিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি হাসুন। দেখবেন সে আপনার কতো আপন হয়ে গেছে।

কুশল বিনিময় : কারো সঙ্গে আলাপচারিতার শুরুতেই কুশল বিনিময় করুন। অন্যের আনন্দ, সুখ-দুঃখ-বেদনার খোজ খবর নিন। গভীরভাবে জানতে চেষ্টা করুন তিনি ও তার পরিবারের কথা।

প্রাণবন্ত থাকুন : ফুর্তিবাজ, আনন্দবাজ, জোকার, সর্বদা সদালাপী, হাসি-খুশি মানুষের সহচার্য সকলেই পছন্দ করে। তাই সব সময় সজীব ও প্রাণবন্ত থাকার চেষ্টা করুন। যদি কোনো কারণে মন খারাপ হয়েই যায় তবে মুখের মলিনতা মনের গভীরে চেপে রাখুন। মনে রাখবেন Morning shows the day - উষা লগ্নই দিনের প্রতিচ্ছবি। আপনার চেহারাই বলে দেবে আপনার ভেতরের খবর। ভুলে গেলে চলবে না, গোমরামুখো, একমুখো মানুষকে কেউ-ই গ্রহণ করে না, বরং সবাই এড়িয়ে চলে।

গিফট দিন : প্রিয়জন, আপনজন, পরিচিতজনদের জন্মদিন, বিয়ে বার্ষিকী, নববর্ষ ও ঈদসহ ধর্মীয় উৎসব পার্বনে শুভেচ্ছা জানান, কার্ড পাঠান, টেলিফোন করুন। সম্ভব হলে সামান্য ফুলসহ গিফট পাঠান। দেখবেন আন্তরিকতা, হৃদতায় পূর্ণতা লাভ করেছে আপনাদের সম্পর্ক।

সহানুভূতি প্রকাশ : মানুষের সুদিনে-দুর্দিনে, আপদে-বিপদে সকল অবস্থায় পাশে গিয়ে দাড়ান, সান্ত্বনা দিন। অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হোন, আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটান। দেখবেন আপনি তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে গেছেন।

প্রশংসা করুন : অপরকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিন। দেখবেন আপনাকেও মানুষ মর্যাদা দিচ্ছে। অন্যের যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ন করুন। তার কৃতিত্বপূর্ণ সফলতার জন্য হৃদয় উজাড় করে প্রশংসা করুন।

দয়াশীলতা : কারো প্রতি রাগ, ঘৃণা, ঈর্ষা, বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করবেন না। ক্রোধ, উত্তেজনা ধৈর্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করুন। এমনকি শত্রুকেও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন। দেখবেন মানুষও আপনার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখছে, আপনাকে ভালোবাসছে, আপন করে নিচ্ছে।

সৌজন্যতা প্রকাশ : আবালবৃদ্ধবনিতা সবার সঙ্গে ভদ্রতা, সৌজন্যতা প্রকাশ করুন।

মানুষকে ভালোবাসুন : ওই যে একটি গান আছে, *মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে*। মানুষকে ভালোবাসুন প্রাণভরে, স্নেহ-মমতার সঙ্গে হৃদয়ের কাছে টানুন। সুখ-দুঃখ সর্বঅবস্থায় বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিন। দেখবেন সবাই কেমন যেন শুধু আপনাকেই ভালোবাসছে, আপন ভাবছে। ধীরে ধীরে আপনি পরিণত হবেন এক পরিচিতি বিশাল ব্যক্তিত্বে। আপনার সুনাম, সুখ্যাতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়বে চারদিকে বিস্তীর্ণ অঙ্গনে। আপনার অনুপস্থিতিতে আপনি হবেন এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, মানুষ তো শুধুই মানুষের জন্যে। সুতরাং সদাচরণ করলেই হয়।

রায়েরবাজার, ঢাকা থেকে

বেহেশত

- আবুল কালাম আজাদ

মৈনাক পর্বতের মতো আমার বৌ মৌ। আমার ওজন ৬৩ কেজি এবং তার ১৩৭। সাইজেও বিশাল। থ্ পিস থেকে শুরু করে পায়ের জুতা কিছুই তার রেডিমেড কিনতে পাওয়া যায় না। এমন কি কানের লতি মোটা হওয়ার কারণে অনেক কানের দুল সামনে ভেদ করে পেছন পর্যন্ত পৌছায় না।

বিয়ের সময় তার জন্য বেনারসি কিনতে গিয়ে ভারি বিপদে পড়লাম। এতো বড় শাড়ি কোথাও পাওয়া যায় না। আমি ঠিক করলাম সার্কাসের তাবু কিনে শাড়ি হিসেবে চালিয়ে দেবো। শেষে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার

করেন তার বাবা। ভদ্রলোক (আমি তাকে এখনো আংকল ডাকি) কোথা থেকে যেন বস্তার মতো দেখতে একটা জিনিস নিয়ে আসেন। ওই যাত্রায় আমি বেচে যাই।

তাকে নিয়ে প্রায়ই আমাকে সমস্যায় পড়তে হয়। একবার কিছু টেস্ট করানোর জন্য এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাই। গিয়ে দেখি *স্কুল খুইলাছে রে মাওলা স্কুল খুইলাছে।* অনেক সিরিয়াল। কাগজপত্র জমা দিয়ে ওয়েটিং রুমে বসতে গেলাম। ওখানে আগে থেকে বসা ছিল এক অল্প বয়সী মহিলা এবং তার কোলে বাচ্চা। বাচ্চাটা আমার স্ত্রীকে দেখে হাউ মাউ করে চেচিয়ে কেদে উঠলো। বাচ্চার মা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঝাকাতে লাগলেন, এবং বলতে লাগলেন, না না, কাদে না, কাদে না, ভয় নেই। আমি তো আছি, ভয় নেই।

আমরা ওই দিন মনের দুঃখে পরীক্ষাগুলো না করেই চলে এলাম।

মোটা হওয়ার জন্য একজন মানুষের যতো প্রকার শারীরিক অসুবিধা থাকতে পারে তার সবই আছে। বিয়ের আগ থেকেই ক্রনিক হাই প্রেশার এবং ডায়াবেটিস ছিল। টনসিল, মাইগ্রেন, হাইপার হাইড্রোসিস তার নিত্যদিনের সঙ্গী। শরীরের মধ্যে মোটা চর্বি থাকার কারণে গরম লাগে খুব বেশি। মাঝে মধ্যে আমাকে বলে, জিমি, খুব গরম লাগছে। আজকে আমি খাটের ওপর ঘুমাই। তুমি খাটের নিচে শোও।

তাকে কোনো রিকশাচালক নিতে চায় না। নিলেও ভাড়া খুব বেশি চায়। বিয়ের আগে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বাবা, মেয়ে তো নয় যেন কুস্তিবিদ! হাত–পাগুলো নিশ্চয়ই লোহার মতো শক্ত হবে। আস্তে আস্তে আমার এই ধারণা ভেঙে যায়।

মনে পড়ে বাসর রাতের কথা। পরিবেশটা হালকা করার জন্য তাকে একটা আংটি উপহার দিলাম। সে আমাকে দিল দুইটা ক্যাডবেরি চকোলেট। সেই সূচনা।

বিয়ের পর অনেক খাওয়া–দাওয়া কন্ট্রোল করতে বলেছি।

একবার আমার ওপর রাগ করে ছয় মাস শুধু সালাড খেয়েছিল।

ছয় মাস পর ওজন আরো বেড়ে যায়। মাদ্রাজ গিয়ে খুব বড় একজন ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। ওই ডাক্তার আবার এক লাইন বেশি বোঝে। আমার সামনে আমার স্ত্রীকে বলে মোটাত্ব এক ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগ। পরিমিত পুষ্টির অভাবে মানুষ মোটা হয়।

এরপর থেকে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বিভিন্ন স্থান থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে তাকে আপন করে নেয়া। বাসায় যতোক্ষণ থাকি কানের কাছে একই ঘ্যান ঘ্যান, জিমি, আমার পুষ্টির অভাব হচ্ছে। তুমি বুঝতে পারছো না। হোক আদর্শ খাদ্য, প্রতিদিন পাচ লিটার দুধ খেলেই পুষ্টির সব উপাদান পাওয়া যায় না।

দাম্পত্য জীবনের এই বারো বছরে খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কোনো আলাপ তার সঙ্গে করতে পেরেছি কি না মনে পড়ে না।

একটু আগেও বলে গেল, নাওমির আব্বু, একটা মেশিন বের হয়েছে। উপরে দুইটা ফুটা। একটা দিয়ে ময়দা এবং অন্যটা দিয়ে পানি ঢুকিয়ে দিলে নিচ থেকে গরম গরম ঘিয়ে ভাজা পরোটা বের হয়ে আসে।

তার গাল দুটো বড়। মনে হয় যেন দুই গালে দুটো অস্ট্রেলিয়ান লাল টুকটুকে আপেল ভরা আছে। আমার যখন এসি ছিল না তখনো প্রায়ই কাদো কাদো গলায় হুমকি দিতো, দেখো, গরমে আমার গালের চর্বিগুলো সব গলে যাচ্ছে। আমি হাটলে এগুলো আর ওঠা–নামা করবে না।

পাঠকদের নিশ্চয়ই মধ্য রাতের ঘটনাবলি নিয়ে কৌতূহল হচ্ছে।

আমরা দুজনেই সমান নীতিতে বিশ্বাসী। আমি যেমন চাই না আমার এই ক্ষুদ্র দেহের ওপর কোনো ড্রাম চেপে বসুক তেমনি সে নিশ্চয়ই মেনে নেবে না যে, এই লিলিপুট তার শরীরের প্রতিটি বাকের অলিগলিতে সারা রাত সোনার খনি খুজে বেড়াক। সুতরাং *একের তরে অপরে ঘোরা, উভয়ে আমরা উভয়ের উপরে।* এটা সম্ভব হয়েছে তার একটা মাস্টার্স ডিগ্রি এবং আমার সুপৃম কোর্টে সাত বছরের অভিজ্ঞতার ফলে।

তবে সে খুব ভালো। ঘুমের ভেতরে কোনো দিনও তার মোটা হাত–পাগুলো আমার গায়ের ওপর ফেলেনি। কোনোদিন খুব অসুস্থ হয়েও পড়েনি যে, তাকে কোলে করে ক্লিনিকে নিয়ে যেতে হয়েছে। এসব দিক দিয়ে আমি মহা খুশি।

এবারের সেন্ট ভ্যালেনটাইনস ডে–তে তাকে অনেক অনেক আইসক্রম এবং মজার মজার চকোলেটের শুভেচ্ছা। প্রতিবার এই দিনে মৌ দারুণ সব মেনু তৈরি করে হাসি মুখে শাড়ি পরে আমার সামনে এসে বসে।

পৃথিবীতে সে আমার বেহেশত।

আমরা খুব সুখে আছি।

মগবাজার, ঢাকা থেকে